ISSN : 2347-6621

(Padi)

সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

দ্বাদশ বর্ষ, শরৎকালীন সংখ্যা, ১৪২৫

পাড়ি
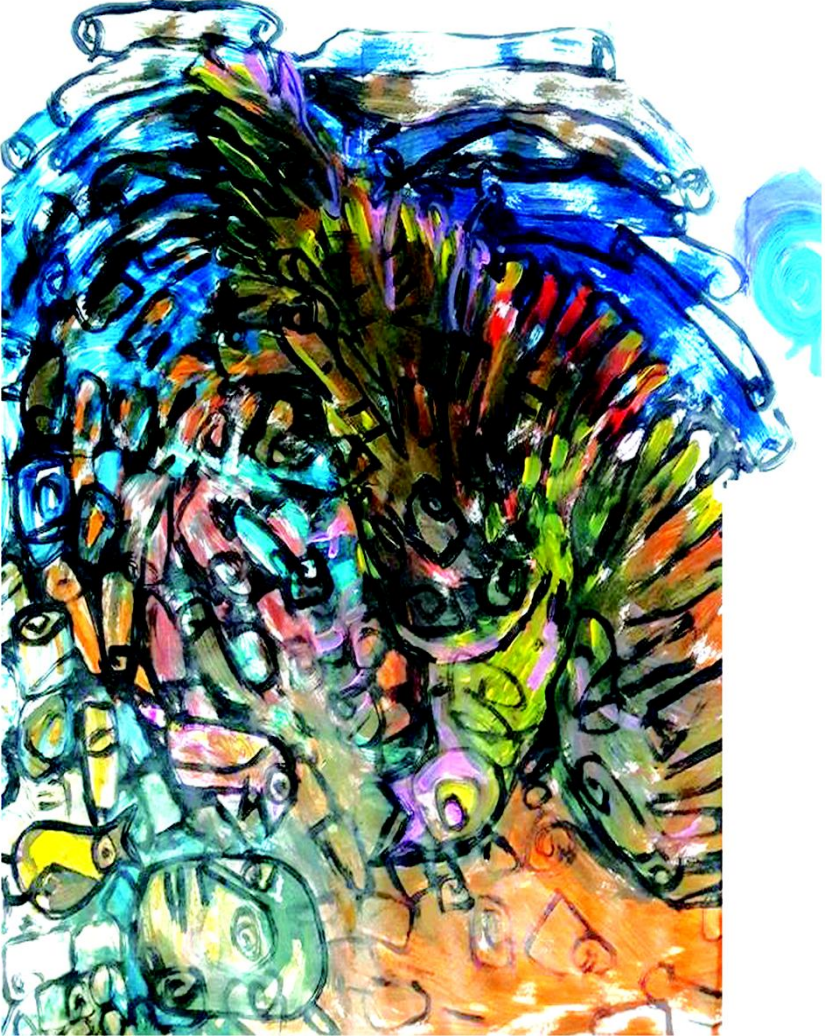
সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

দ্বাদশ বর্ষ, শরৎকালীন সংখ্যা, ২০১৮

পাড়ি
সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা
দ্বাদশ বর্ষ, শরৎকালীন সংখ্যা, ২০১৮

সম্পাদক ঃ চন্দন মিত্র

সম্পাদন-সহযোগী ঃ অমলেন্দুবিকাশ দাস, দীপেন্দু হালদার, সুশান্ত দেবশর্মা, মানসকুমার হালদার, অনুপম পাত্র, অরূপ কয়াল, প্রবীরকুমার প্রামাণিক, অভীক হালদার, বিজন মিত্র, সুব্রত বায়েন, সুমন চক্রবর্তী, সমীর ঘোষ এবং লক্ষ্মী টি স্টল-এর বন্ধুরা।

প্রচ্ছদ ঃ সাজিদুল ইসলাম ও মৌসুম মণ্ডল

মুদ্রণ ও অক্ষরবিন্যাস ঃ রিতিকা ডিটিপি সেন্টার
ফতেপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

প্রাপ্তিস্থান ঃ ধ্যানবিন্দু, কলেজ স্ট্রিট
অরণ্যমন প্রকাশনী, কলেজ স্ট্রিট
অশোক পুস্তকালয়, ডায়মন্ড হারবার
লক্ষ্মী টি স্টল, ডায়মন্ড হারবার

যোগাযোগ ঃ চন্দন মিত্র
ভগবানপুর (হরিণডাঙা), ডায়মন্ড হারবার,
দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, সূচক- ৭৪৩৩৩১
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত,
চলভাষ – ৯৩৩২৩৫৮৭৪৭
বৈদ্যুতিন ডাক - mitrachandan59@gmail.com

বিনিময় ঃ পঞ্চাশ টাকা

পাড়ি
সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা
দ্বাদশ বর্ষ, শরৎকালীন সংখ্যা, ২০১৮

সূচিপত্র

আমাদের কথা ৪

কবিতা : ৫ - ১৩
বিপুল চক্রবর্তী, শোভন মণ্ডল, সুমনকুমার নায়েক, মানসকুমার হালদার, বিদিশা দাস, আশিস ভট্টাচার্য, নিরাশাহরণ নস্কর, প্রবীরকুমার প্রামাণিক, ঋতো আহমেদ

প্রবন্ধ : ১৪ - ৩০
চাষিঘরে শিল্প ঃ কর্মের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে চলা – অরবিন্দ পুরকাইত
কবি সুবীর মণ্ডল ঃ একটি প্রয়াণলেখ – প্রবীর মণ্ডল

কবিতা : ৩১ - ৩৫
তৈমুর খান, জগবন্ধু হালদার, দীপেন্দু হালদার, মণিকা নস্কর, অমলেন্দুবিকাশ দাস, পুলক মণ্ডল, রাবণ, দেবজিৎ দে, সরিফুল ইসলাম, প্রিয়দর্শী

অণুগল্প : ৩৬ - ৩৯
বিশ্বজিৎ সাহু, অনীশ খ্যাপা, অবকাশে সঞ্জয়, খাঁ সাহেব, সুব্রত হালদার, প্রকাশ কর

অনুবাদ কবিতা : ৪০ - ৪১
বব ডিলানের কবিতা – শিশির দাস

প্রবন্ধ : ৪২ - ৪৮
ক্যারিবিয়ান কাব্যের দ্রোহীকন্যা গ্রেস নিকোল্‌স – পাপড়ি মিত্র

কবিতা : ৪৯ - ৫৮
অনুপম পাত্র, হিমাদ্রি মুখোপাধ্যায়, বি কে স্বপন, শান্তনব চৌধুরী, আজিজুল হক বাবলু, চন্দন দাস, অরুণ পাঠক, চন্দ্রনাথ মণ্ডল (বিট্টু), শিশির দাস, শুধুই স্বরাজ, সৈকত, সুমন চক্রবর্তী, সুমিত মোদক, মৈনাক সরকার

প্রবন্ধ : ৫৯ - ৬৮
জেন : রিপুতাড়িত মানবের নিকট সুসমাচার – চন্দন মিত্র

আমাদের কথা

কালো মেঘে সাঁঝ কইর‍্যাছে

যাত্রা বিরতি মানেই হাল ছেড়ে দেওয়া নয়। আবার আমরা 'উই আর ইন দ্য সেম বোট ব্রাদার' গাইতে গাইতে নাও ছাড়লাম। এক দুর্বিষহ দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় আমাদের এই যাত্রা। টলমল নৌকায় দোদুল্যমান আমরা এগিয়ে চলেছি। প্রাণপণে উচ্চারণ করছি চরৈবেতি মন্ত্র। মাথার উপর ঝামরে পড়ছে বজ্রগর্ভ মেঘ। ঝড় যেন নটরাজের নৃত্য। অন্ধকার এতটা নিকষ যে অনুসরণযোগ্য কোনও বর্তিকা চোখে পড়ছে না। ঝাঁকঝাঁক ঝান্ডাবহ ছায়ামানব আমাদের ঘিরে ধরছে ; কানে দিচ্ছে ফুসমন্তর। আমরা কী আচ্ছন্ন হয়ে ঝান্ডাবহদের জুলুসে পা-মেলাব! আমরা কী প্রতিষ্ঠানের ক্রীড়নক হয়ে আদর্শের উজ্জ্বল পলাশপতাকা জলাঞ্জলি দেব। না। নগরে আগুন লেগেছে দেখে নিজের ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার মতো আহাম্মক বা ভীতুর ডিম আমরা নই।

না-ফেরার দেশে নিখিলরঞ্জন (১৯৫৫ - ২০১৮)

চলে গেলেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার অন্যতম শক্তিশালী কবি নিখিলরঞ্জন হালদার। কবি-পরিচিতির জন্য হয়তো কেবল প্রতিভাই যথেষ্ট নয়। তা যদি হতো তাহলে নিখিলরঞ্জন হালদারকে পশ্চিমবঙ্গের অনেক পাঠক ই চিনতেন। ডায়মন্ড হারবারের লক্ষ্মী টি স্টলের আড্ডায় আমরা তাঁকে বহুদিন পেয়েছি। কখনও নিজের কবিতা আবৃত্তি করেছেন, কখনও মজাদার গল্প শুনিয়েছেন। ধোপদুরস্ত পোশাক-পরিচ্ছদের লোক ছিলেন না, এক গ্রামীণ সারল্য ছিল তাঁর সর্বাঙ্গে। তাঁর শেষ কাব্যগ্রন্থ 'সোমা আমার সোমা' প্রকাশিত হয় ২০১৬ সালে 'পাড়ি প্রকাশনী' থেকে। এই কাব্যগ্রন্থের সূত্রে তিনি আমাদের কাছের-মানুষ হয়ে উঠেছিলেন। নিখিলদার মতো মানুষের সঙ্গ যাঁরা পেয়েছেন তাঁদের কারও পক্ষে তাঁর কথা ভোলা সম্ভব নয়। আমাদের পরিচিত সুন্দর মানুষদের তালিকা থেকে একটি নাম মুছে গেল।

বিপুল চক্রবর্তী-র কবিতা

সন্ধ্যার শায়েরি কিংবা সকালের গান

কারা যেন কত পথ হেঁটে
একদিন আকাশের স্লেটে
লিখেছিল শতভিষা, স্বাতী
লিখেছিল কত নাম আরও

সন্ধ্যার শায়েরি সেই থেকে
তারায় তারায় জ্বালে বাতি

তুমি তা কী মুছে দিতে পারো!

কারা যেন পথ ঘুরে কত
আকাশের নক্ষত্রের মতো
বুনেছিল মাঠে মাঠে ধান
বুনেছিল শস্য কত আরও

একতারার তারে সেই থেকে
গুনগুন সকালের গান

তা কী তুমি মুছে দিতে পারো!

অনির্বাণ

আকাশের নীচে প্রদীপে ও পিলসুজে
আলোর ঠিকানা কবেই পেয়েছি খুঁজে

দিবস ফুরালে এসেছে যখন যামিনী
আমরা চলেছি, আমরা কোথাও থামিনি

আমরা জেনেছি নক্ষত্রেরও ভাষা
আমরা জেনেছি নিশীথের ভালোবাসা

মাটি ছেনে ছেনে গড়েছি প্রদীপখানি
গেরুয়া জেনেছি, গেরিমাটিকেও জানি

হারাব না তাই কখনও অন্ধকারে
নিভে গিয়ে জ্বলে প্রদীপটি বারে বারে

শোভন মণ্ডল-এর কবিতা

গোপনচারিণী

যেভাবে বুকের দুপাশে বৃষ্টি নামে
যেভাবে খসে যায় তারা অজানা ইঙ্গিতে
তেমনই নেমে এসো
ছুঁয়ে যাও গোপন চৌকাঠ

কাজলের শেষটানে যেমন লেগে থাকে আদর
ঠোঁটের ছন্দে যেভাবে লুকোনো থাকে পতন
সেভাবেই নেমে আসে প্রেম অচেনা-সরণি বেয়ে

তুমি যদি ইশারা বোঝো, তবে
অন্তত একবার
প্রেমের কবিতা হবে মেয়ে ?

আঙুল আলগা হলে

এরপর কুয়াশায় হারিয়ে যাবে পথ
জোনাকিদের রতিক্রিয়া শেষ হলে ঝরে যাবে ম্যাপলের পাতা
নোনতা ফোঁটায় ভিজে যাচ্ছে নিষিদ্ধ রুমাল
জড়িয়ে যাচ্ছে ধোঁয়ার কুণ্ডলী
আদুরে ডাকনামে আনমনা পড়ন্ত বিকেল
দুটো লম্বা-রেসের-ঘোড়া এইমাত্র ছুঁয়ে ফেলল অলৌকিক প্রাচীর

এখানেই মিলিয়ে যাচ্ছে ফিরে যাওয়ার ট্রেন
এখানেই আমরা বলেছি, কে কতটা দায়ী
আঙুল আলগা হলে এভাবেই
প্রেমের মৃতদেহ ছুঁয়ে আছি
দুই আততায়ী

সুমনকুমার নায়েক-এর কবিতা

জন্মান্তর

আমার স্বপ্নের ভিতর জেগে ওঠেন — জন্মান্তর!

পাতলা-মনখারাপের মতো কুয়াশা সরিয়ে-সরিয়ে, মাঠ পেরিয়ে,
ভোর ফোটাতে ফোটাতে এগিয়ে আসছেন —
আমার বাইশ বছর বয়সি প্রপিতামহ!
সেদিকে মুখ করে ধ্যানস্থ দাঁড়িয়ে — আমাদের পারিবারিক প্রাচীন অশ্বত্থ গাছ,
পাশে জীর্ণ বিষ্ণুমন্দির!
গুঁড়োগুঁড়ো চারপাশে ভেঙে পড়ছে পাখিদের ঘুম ...

আর, এই সবকিছুর দিকে অপলক তাকিয়ে আছি —
ভূমিষ্ঠ না-হওয়া আমি ... !

ঈশ্বরে ভক্তির মতো

তোমার সাথে দেখা হলেই
আগাছার মতো থমথমে-অভিমানে ভরে ওঠে
আমার পুরোনো দালানকোঠা!
শিরা ধমনী হাড় পাঁজরের ফাঁকফোকর দিয়ে
লতিয়ে-লতিয়ে গজিয়ে ওঠে – ফ্রাসট্রেশনের লকলকে আকর্ষ!

যেন আমি এক আলোহীন স্যাঁৎসেঁতে পরিত্যক্ত হানাবাড়ি!

তবু তো একদিন লাইন টপকে তোমার হাওয়া এসে
তিরতির কাঁপিয়ে গিয়েছিল ছায়াবটের পাতা,
লাল শালুতে বাঁধা ছোটো ছোটো মনস্কামগুলোর মতো
দুলেদুলে উঠেছিল পারস্পরিক ভালোলাগাগুলো!

আর কিছু না থাক, জানি, এইটুকু সত্য বেঁচে থাকবে চিরকাল
ঈশ্বরে ভক্তির মতো ...

মানসকুমার হালদার-এর কবিতা

একটু ভালোবাসার জন্য

তোমাকে ভালোবাসি বলাতে যখন বৃষ্টি হবে না!
তখন আকাশ আরও বেশি স্বেচ্ছাচারী যেন
মেঘগুলো সরে যায় পাহাড়ের দিকে তবু
পাহাড়ের ওপারে যে আকাশ আছে;
সেও বুঝে যায় মেঘগুলো এখন আর
কাছে এলে বহুদূর ভাসে না — শুধু আকাশ
লক্ষ্য করে অন্য আকাশের দিকে যেতে চায়।
সেখানেই হয়তো নূতন করে পৃথিবীর সব মেঘ
বেশকিছুদিন ভালোবাসাবাসি হলে হতে পারে বৃষ্টিও।

আগুন নেভেনি

তোমার যে স্পর্শে আগুন বারবার জ্বলে ওঠে
সেখানেই হয়তো সারাঘর নিভে আছে
তুমি তো বোঝোনি — নিঃশব্দের কাছে ফিরে এসে
অন্ধকারের অন্য কোনও তারা নেই তবু
যে আগুন ভালোবাসি বলে বারবার জ্বলে ওঠে
তা এখনও আমাদের থেকে বহুদূর।

তুমি

ভালোবাসা মানেই নদীর গভীরে
চাঁদ দেখে
অশরীরী রক্ত ও অন্ধকার
চোখের জলে যেভাবে গড়িয়ে যেতে চায়
তুমি আসলে তা নও ...

বিদিশা দাস-এর কবিতা

অপেক্ষমাণ

এখনও পাতা ঝরেনি তেমন,
এখনও কথারা রয়েছে বাকি,
পুরোনো অভ্যেসে শুশ্রূষা ফুরোলে
ভ্রমণ আয়োজন থাকে নাকি!

এখনও অপেক্ষারা প্রলাপ বকে
এখনও নীরবতা শুধু তুমিময়,
যে ছায়ার নাম মোহবিষণ্ণতা
তার কাছে দুঃখেরা চির অক্ষয়।

এখনও জোনাকিরা রাত্রি জাগে
এখনও গভীরে চুপিচুপি ঢেউ,
অথচ বিলীয়মান শোকের মলাট
এখনও অনন্ত প্রতীক্ষায় কেউ।।

প্রকৃত প্রস্তাবে

আমার জন্য কিছু ছিল না,
যদিও আবদার ছিল এক সহস্র,
রক্তকরবীর আলো অথবা চূড়ান্ত মুগ্ধতা
যা কিছুই প্রার্থিত ছিল তা শূন্যতার ব্যথা।

কখনও তো বলিনি আঁকড়ে থাকব,
আমিও তো ভিনদেশি জন্মান্তরকামী,
ছিল তো অল্পস্বল্প নিভৃত অভিমান,
ঘুমভাঙা খয়েরি অগ্নিপথ; তুমুল নির্মাণ।
যদিও কী যে এক তীব্র টান ছিল?
অমোঘ অভিযোগে চোখ জুড়ে নিবিড় ছায়া,
হাজারো ভাঙন ঘেঁষা পিছুটান, আঁচল ভরা মায়া
এটা ওটা সেটা ছিল, কত কথা ব্যথা ছিল
শুধু আমার জন্য কিছু ছিল না ...

আশিস ভট্টাচার্যের কবিতা
এই আছি এই নেই

রুনু তোর সঙ্গে ছিল কেউ
রুনু তার পায়ের নীচে ঢেউ
রুনু তার ঘরে ভীষণ একা
রুনু তোর একার আকাশ ফাঁকা

রুনু তার রেলিং ঝুঁকে মনে
রুনু তোর সৌম্য কীসের টানে
রুনু তোর ঘুম আসে কোনখানে
রুনু সে সমস্ত পথ জানে

বুকে রুনু ওড়না খসে যায়
স্রোতে রুনু ব্যস্ত বিছানায়
রুনু তোর সময় হল নরম
আঁচে তোর শহর অন্যরকম
চোখে রুনু ল্যাকমে ছুঁয়ে পড়ে
সবে রুনু শুদ্ধ চানঘরে
রুনু তার অকুস্থলে ঢেউ
রুনু তোর নতুন ঘরে কে ও ?! . . .

আপাতত

অতলান্ত অপেক্ষার পর নামে উচ্ছ্বাস
তখন তো মজে গেছে উৎসব
ছায়া-ভিড় ঠেলে ক্লান্ত রসিক
রয়ে যায় একান্ত যাপনে !

এ সময় ঋতুস্রাবময়
উশখুশে ইচ্ছেদের দল সন্ন্যাস নেয়
খামোখা কালি লাগে সমস্ত দৃশ্য জুড়ে
পিরিত সম্ভাবনা আজ বন্ধ !

আপাতত রঙহীন এ বসন্ত ও বৃন্দাবন ... !

নিরাশাহরণ নস্কর-এর কবিতা

স্বপ্ন

স্নিগ্ধ স্বপ্নের পাশে ধুনুচি রাখি না
আগুন অথবা ধোঁয়া নাস্তি-অস্তির
প্রভেদ মানে না

বহ্নিমান চিতার আগুন বেয়ে ছাই ওড়ে
কাঠের না শবের?
বৃথা প্রশ্নে দিন কাটে রাত বাড়ে
বুদ্‌বুদের পাহাড় জমে স্রোতহীন
শ্যাওলার দামে

স্নিগ্ধ স্বপ্নের পাশে কখনও ধুনুচি রেখো না, শুভমিতা
স্বপ্ন বড় মায়াবী তোমার চুম্বনের মতো

আশ্রয়

করতলে খরস্রোত
গরলকুণ্ডে পুড়ে যায় পাতা

তবুও পৃথিবীর বারান্দায়
সন্ধ্যার জাজিমখানি পাতা

বিনির্মাণ

১
বোঁটা থেকে খসে পড়লে রাত
দুঃস্বপ্নে বুজে যায় শিশিরের চোখ

উঠোন জুড়ে পড়ে থাকা শিউলির শব
ফিনিক্স বেশে সুবাস ছড়ায় রোজ . . .

২.
বাঁধন খুলে দাও
বজ্রগিঁটের প্রত্নপ্রেম শিখুক উড়াল

পরিযায়ী পর্যটনে আবিশ্বের জ্যোতিঃপুঞ্জে
ডানা পাক নিঃসঙ্গ রুমাল . . .

প্রবীরকুমার প্রামাণিক-এর কবিতা

অস্তিত্ব-১

বর্ণ-চোরা অস্তিত্বের শিকড়ে দেখি শূন্য মত্ততা।
মাতাল শরীরজুড়ে বিচিত্র কারুকার্য অনিঃশেষ।
আদিম রক্তস্নানে শুদ্ধ হয় পৃথিবীর স্রষ্টারা।

বিচিত্র-ভঙ্গিতে সুর তোলে অসূয়া পৃথিবী।
মাটির ভিতরে ইতিহাস ফেনায়িত হয়
শিল্পিত পৃষ্ঠায়।
আমার অবসন্ন চেতনায় গ্রহণ লাগে।

তারপর নির্বিকল্প-চলা ....

কণায় কণায় অস্তিত্বের অনুভব
আমি আছি — কিংবা নেই
পৃথিবী আছে — কিংবা নেই
তবুও তো আছে
আমার অস্তিত্ব !

অস্তিত্ব-২

আমাকে ধরবার জন্য প্রাণপণ
ডারউইন থেকে ডি এন এ —
রক্তবীজেরা খেলা করে গান্ধি থেকে মার্কস-এ

আমাকে ধরবার জন্য
ধ্যানবিন্দু ছাড়িয়ে
অতলান্তিক
হাতড়ে হাতড়ে সবুজদ্বীপে ...

এভাবে খুঁজতে খুঁজতে
তোমার সঙ্গে আশ্চর্য
অনুভবে
আবিশ্বে আমি একা এবং একা
অন্তহীন ....
তবু
এক॥

ঋতো আহমেদ-এর কবিতা

সন্তরণ

নিরুদ্দিষ্ট আমি আর আমার মহাকাল —
হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর চলে এসছি। পেছনে, অনেক আগের হারিয়ে যাওয়া বন্ধুর মুখ সমুদ্রে ডুবে আছে। আর আমি দেখতে পাচ্ছি তার চোখ মাছের মতোই নিথর-চিহ্ন-বিশিষ্ট হয়ে গেছে। পরনে নীল নোনতা জল।

আমি তাকে ডাকি। হাত নাড়িয়ে ইশারা পাঠাই। বিনিময়ে ভেসে ওঠে একটি হাস্যোজ্জ্বল ইমো। আর, —
জলের পাতাল থেকে শুরু হয় গভীর জলের শব্দ। সন্তরণ।

ও আমার মা, এই জন্ম শেষ হলে, পরজন্মে আমার নাম রেখো সমুদ্দুর ... নাম রেখো মরণ ...

একজন কাকতাড়ুয়ার গল্প

আমার তো কাকতাড়ুয়া হওয়ার কথা ছিল। অথচ দ্যাখো, সেই কবে মধ্যগগনে হেলে আছি, তবু কেন কাকের দেখা নেই? আমি কী তাড়াবো! আমার কপাল বেয়ে গড়িয়ে নামছে সংখ্যারা। রাত নামলেই যাদেরকে তারা হিসেবে দেখতে পাওয়ার কথা অন্তরীক্ষে— তাদের ধারাপাত আমার সাথে নিত্য হয় নিয়মিত। কখনও পাশাপাশি বসে, কখনও কখনও সারি বাঁধে, আবার কখনও মুচকি হেসে এলোপাথাড়ি কুপিয়ে রক্তাক্ত হয় নিজেরাই।

আমার কাকতাড়ুয়াই হওয়ার কথা ছিল। কাকতাড়ুয়া সেজে এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে চেয়েছিলাম তোমার বাগানে। তুমি এসে আমার পোশাক ডিজাইন করে দিতে। আমার চোখে কাজল লাগিয়ে দিয়ে কপালে বড়ো একটা টিকা এঁকে দিতে। আঁচলে মুখ মুছে দেয়ার ছলে কাছে আসতে। তারপর রক্তকরবী হয়ে দুলে উঠতে বাতাসে। সেই বাতাস যে আমার বুকের উপর দিয়ে হেঁটে যায় আজন্ম এই বিরহী অস্তিত্বের মায়ায়। বড়োই অপার্থিব, বেহেস্তি সেই মোহ।

কিন্তু, কেন যে আমার কাকতাড়ুয়া চোখে আমি কোনও কাক দেখতে পাই না! আমার কপাল বেয়ে শুধুই গড়িয়ে নামে সংখ্যারা। রক্তাক্ত — অমূলদ সব সংখ্যা।

প্রবন্ধ

চাষিঘরে শিল্প ঃ কর্মের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে চলা

অরবিন্দ পুরকাইত

উঠোনের এক ধার/ গাছের রংবাহার!

চাষিঘরে একটি শিশু জন্ম থেকে দেখে এসেছে উঠোনের এক ধারে একটি মাচা (মান্য বাংলায় মাচান) বা ভারা। মূলত বাঁশ-কঞ্চির, যেখানে তার অপ্রতুলতা সেখানে গাছের ডালপালা ইত্যাদির। সেখানে প্রথম দৃষ্টিমেলা থেকে সে দেখে আসছে এক-এক গাছের এক-এক ধারা! মাটিতে চারাগাছ হওয়ার পরে, কয়েকটি কঞ্চি বা ডাল মাটি থেকে ভারা বা মাচা অবধি ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে; সেখানে সিমগাছ উঠছে সেই কঞ্চি বা ডালকে পুরো শরীর দিয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে, কুমড়োগাছ উঠছে দিব্যি লম্বা লম্বা আঁকশি বাড়িয়ে বাড়িয়ে জড়িয়ে যেন লাফিয়ে লাফিয়ে আবার পুঁইগাছকে খড় কলাগাছের ছোটা বা দড়ি দিয়ে একটু জড়িয়ে বেঁধে বেঁধে মাচা পর্যন্ত ওঠায় সাহায্য করতে হচ্ছে! মাচায় উঠে যাওয়ার পরে এবার দেখা যাবে তাদের দাপট! কত জায়গা দেবে তাদের! বস্তুত এক-একটা গাছ যে কী পরিমাণ জায়গা দাবি করতে পারে তা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়! খনার বচনে বিখ্যাত 'ঘরের চালে লাউ শশা/ খনা বলে লক্ষ্মীর দশা'। এই সেদিনও এই দৃশ্য হামেশাই ছিল চাষি পরিবারে, এখন অনেকক্ষেত্রে উঠোনের মাটি ইট-বালি-সিমেন্টে ঢাকা পড়েছে এবং সেখানে মূলত কিছু ফুলের বা শৌখিন গাছ। তা সেই লতানে গাছ মাচা ছাড়িয়ে, নাগাল পেলে কোথায়-না-কোথায় ছড়িয়ে দেবে নিজেকে! বিখ্যাত প্রবাদই আছে, কারও চালে কী আমার পুঁইশাক! অর্থাৎ যে, তাকে আমার মনজুগিয়ে চলতে হবে! তা নাগালে চাল পেলেই চলবে, সেটা তাদের যে চাষ করেছে তার কী অন্যের তা ভাবার দায় তাদের কোথায়। তো সেই শিশু দেখছে সেই এক-এক গাছের ডগা এক-একরকম, পাতা এক-একরকম, ফুল-ফল এক-একরকম! উঠোন পেরিয়ে সেই শিশু একসময় সেসব দেখছে তাদের বা তাদের প্রতিবেশীদের খেতে (প্রতিবেশীদের বাড়িতে তো দেখছেই)। এ এক অত্যাশ্চর্য শিল্প! একেবারে ভূমিষ্ঠ-হওয়া-থেকে দেখতে দেখতে বড় গা-সওয়া হয়ে যায় বলেই হয়তো এগুলোর রূপ-সৌন্দর্য নিয়ে আলাদা করে আর ভাবতে দেখা যায় না সচরাচর। তাছাড়া এগুলো কাজের মধ্যে দিয়ে পাওয়া, সচেতনভাবে শিল্পের জন্যেই এগুলোর সৃষ্টি নয় কোনওদিন। আরও একটা ব্যাপার আছে। এগুলো প্রাণধারণের জিনিস, সোজা কথায় ভোগের সামগ্রী। নিতান্ত ভোগের সামগ্রীর সঙ্গে শিল্পের নাকি বরাবরের এক আদায়-কাঁচকলায় সম্পর্ক। কিন্তু না, সভ্যতার ইতিহাস বলে যে ভোগের সামগ্রীর সঙ্গেও শিল্প ওতপ্রোত। আদিম মানুষ গুহাগাত্রে যে ছবি এঁকেছিল তা ভোগের সামগ্রী বাদ দিয়ে নয়। ভোগের সামগ্রী বলে তাদের সৌন্দর্য মনে ধরবে না তা কী করে হবে! সিম-কুমড়ো-পুঁই খাই বলে তার গাছ-ফুল-ফলে কোনো সৌন্দর্য, কোনও শিল্প নেই কে বলবে! কিংবা যোগ্যশিল্পীর হাতে সেসব থেকে শিল্পকর্ম হতেই বা বাধা কোথায়! প্রেক্ষিত অন্য হলেও, 'পুঁইমাচা'-র মতো

অমন গল্প হতে পারে ক'জন ভাবতে পেরেছিলেন বিভূতিভূষণের আগে! যাই হোক, এইরকম এক ভূমিকা দিয়ে শুরু করে, আমরা আসলে একটু ফিরে দেখব চাষিঘরের কিছু শিল্পচিত্রকে। বস্তুত, চাষিঘরে জন্মানো এক শিশু তো কেবল সিম-কুমড়ো-পুঁই দেখেই বড়ো হয় না, বড়ো হয়ে ওঠে আরও বহুকিছু দেখতে দেখতে। তারই ক্ষুদ্র একটি অংশই এ লেখার উপজীব্য।

গিঁট ছাড়া গেরো/ এ কী হল গেরো!

ব্যাপারটা কী সোনার পাথরবাটির মতো হয়ে গেল না! না, আদৌ তা নয়। ধরুন, কোনও বয়স্ক ভদ্রলোক বললেন, আচ্ছা, বেড়া তো দিচ্চো 'বাড়ির-ওপর' (চাষের ডাঙা) — বেড়ার গেরো জানো? আজকের দিনের অনেকে হক্‌চকিয়ে যেতে পারে — বেড়ার গেরো আবার আলাদা কী? হ্যাঁ, বয়স্করা আমাদেরও এসময় দেখিয়ে দিতেন ফাঁস বা সাধারণ গেরো বা গিঁট না দিয়েও কীভাবে দিতে হয় বেড়ার বাঁধন। অনেকেই তা আজ আমরা ভুলে গেলেও, জানা আছে তেমন লোক একেবারে হারিয়ে যাননি নিশ্চয়ই। নারকেলের 'চুমরি' কয়েকদিন পুকুরে ভিজিয়ে রেখে কাস্তে, নিড়ানি, দা বা বড়ো ছুরির সূক্ষ্ম আগার সাহায্যে সমান মাপের 'মুখ ছুটিয়ে' নিয়ে উক্ত অস্ত্রগুলির উলটো পিঠ ব্যবহার করে বাঁধনের উপযুক্ত একের পর এক পুরু লম্বা আঁশি (আঁশ) তুলে নিয়ে তার সাহায্যেই দেওয়া হত বাঁধন। সে বাঁধন মামুলি গিঁটের বাঁধনের থেকে বেশি শিল্পসম্মত যেমন, সহজে খুলে ফেলাও কঠিন। আবার বেড়া তৈরিও সবমসয় কেবল প্রয়োজনকেই প্রাধান্য দেয়নি, সৌন্দর্যকেও গুরুত্ব দিয়েছে। অনেক বেড়া দেখলে আমাদের মুখ থেকে আপনিই বেরিয়ে আসতে পারে, বাঃ!

চলো মাটে যাই/ বিচুলি জড়াই

কথা হল, মামুলি গেরো না দিয়েও বাঁধা হয় ধানের বিচুলি (বিচালি), খড়ের তড়পা ইত্যাদিও। আবার সেই ধান বা খড়ের গাদাও যে-সে দিতে পারে না, তার জন্যে দরকার দক্ষ হাত। আর দরকার ছাপিয়ে অনেকেই তাতে যোগ করতে পারেন বাড়তি সৌন্দর্যও। খড়ের গাদা দেওয়ার সময় মাঝে মাঝেই যেমন পিঁড়ে দিয়ে ঠেসে ঠেসে সমান করে নিতে হয়। একসময় ধানের বস্তাও বাঁধা হত দু-চার 'কালা' খড় দুই হাতে খানিক পাকিয়ে নেওয়ার পর টানটান করে দু-এক প্যাঁচ পেঁচিয়ে তার দুই মুখ একত্র করে পাকিয়ে মরিজ (মরিচ) করে নিয়ে, বাঁধনের স্থানে কয়েকটা বেড় দিয়ে টানটান করে খোঁপার আকারে ছেড়ে দিয়ে, ফটাফট কাতা বা টুন দড়ির গিঁটের মতো গিঁট দিয়ে নয়। প্রসঙ্গত, কাটার সময় ধান দু-রকমভাবে রাখা হয় অর্থাৎ ধানগাছ কেটে দু-রকম সারি করা হয় — 'সিংগল' আর 'বিচে'। এই 'সিংগল সার' বা 'বিচেসার' অনেকসময় একমুঠো করেও রাখা হয় — মাঠ থেকে শীঘ্র আনার জন্য ধানগাছ যখন তাড়াতাড়ি শুকোনোর প্রয়োজন হয় (ভিজে স্যাঁৎসেঁতে জায়গা বা মেঘলা আবহাওয়ার কারণেও হতে পারে)। সেক্ষেত্রে এমনই একটি মুঠো থেকে 'নিউলি কেটে' নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই মুঠোটি তুলে নিয়ে পরের মুঠোটির উপরে

রেখে একসঙ্গে বাঁধা বা 'বিচুলি জড়ানো' হয় (যেমন, বিড়ি বাঁধাকে হামেশাই বলা হত 'বিড়ি জড়ানো')। যাইহোক, বলার কথাটি হল এই যে, একটি মাঝারি বা বড়ো জমিকে এমন সিংগল বা বিচেসার-দেওয়া (বা, সার-ফেলা) অবস্থায় দেখতে দারুণ লাগে! আর বিশেষ করে এই বিচেসার এমনভাবে দেওয়া হতে পারে, জমিতে কাদা এমনকি খানিক জল জমে থাকলেও, ধানের শিষ জলস্পর্শ করবে না অর্থাৎ নষ্ট হবে না! ধানের গোড়াও রাখা হবে বড়ো-করে-রাখা নাড়া সামান্য ফাঁক করে তার উপরে। অর্থাৎ এক-একটি বিচুলিতে পরিণত হওয়ার জন্যে প্রস্তুত পুরো ধানগাছ শুয়ে থাকবে যেন নাড়ার মাচানের উপর, নিজেদের গায়ের উপর মাথা রেখে রেখে!

আহা, খড়ের চাল/আজ তোমার কী হাল!

এককালে যে খড়ের চাল হত, তাতে দেওয়া হত বেতের বাঁধন। হাতের আঙুলের মতো সরু দীর্ঘ চেড়ার দেড় থেকে দুই ইঞ্চি বর্গাকার চতুষ্কোণ খোপ খোপ সেই চাল। তাদের নিয়ে মোটা বাতার খোপগুলো আট ইঞ্চি থেকে ফুটখানেক মাপের। ব্যাপার হল, মোটা বাতার কেবল উপরে চেড়া বসিয়ে বসিয়ে কাতা দড়ির বাঁধন বা পেরেক সাঁটার সহজ পদ্ধতি নয় (সাধারণত টালির চালে যেটা করা হত, পরের দিকে 'শর্টকাট' হিসাবে করা হত খড়ের চালেও), সেই চাল হত মোটা বাতার নীচে এবং উপরে ওই আঙুলের মতো সরু বাতা রেখে, বেতের আঁশ দিয়ে উপর-নীচ কয়েক পাকে ভালো করে এঁটে দুই বাতার বাঁধনের টানটান করা অংশের মাঝখানে রাখা বাড়তি আঁশ কয়েক পাক ঘুরিয়ে গুঁজে টেনে দিয়ে। অর্থাৎ বেত থেকে আঁশি তুলে নিয়ে সেই যে বাঁধন তাতেও কিন্তু থাকত না মামুলি গিঁট। পুরো চাল সেইভাবে তৈরি হয়ে গেলে, সে এক অপরূপ শিল্পকর্ম হয়ে উঠত! চোখে যে না দেখেছে ধারণা করতে পারবে না, এমনকি হয়তো চাইবে না বিশ্বাস করতেও। আমাদের মাটির ঘরের খড়ের চাল তেমনই ছিল। সেই খড় নীচের দিক থেকে চঞ্চুতে করে খানিক বের করে করে কত চড়ুই বাসা বাঁধত দাওয়ার চালে! সেখানে ডিম পাড়ত, ছানা হত তাদের। তার লোভে বেয়ে বেয়ে সাপ (মূলত দাঁড়াশ যা আমাদের চাষিঘরে অনেকের কাছেই 'বাস্তুসাপ') উঠে পড়ত কখনও কখনও!

এর পর খড়ের ছাওন। লম্বা টেকসই ভালো মানের খড় ভিজিয়ে জল-ঝরিয়ে দেওয়া সেই ছাওন সম্পূর্ণ হলে ঘরের চাল যেন হাসে। চালের 'মটকা মারা'র সময়েও, কোনও কোনও ঘরামি দুই প্রান্তে দুই শৃঙ্গ বা মুকুট ইত্যাদির আকার দিয়ে তা করে তুলতেন আরও দৃষ্টিনন্দন! সেই চাল যখন পুরোনো হত (এক বছর কোনও চাল হয়তো না ছেয়ে বা 'খোঁচ দিয়ে' চালিয়ে নেওয়া হল। চালের অর্থাৎ ছাওনের অবস্থা ভালো থাকলে, অনেকসময় পরের বছরটিতে আর ছাওয়া হত না), বর্ষাকালে বৃষ্টির সময় একাধিক চালের একাধিক রঙের জলের সঙ্গে (হয়তো কোনও একটা ঘর বা গোলার চালটি সে বছরেই ছাওয়া, একটি আগের বছরের) উঠানের সাধারণ জলের বা কোনও দিকের মাটি-ধোয়া ঘোলা জলের গায়ে-গায়ে-লাগা 'ঝোর'-এর দিকে ধাবমান স্রোতকে বড়োদের থেকে শিখে আমরা বলতাম, ওই দেখ, গঙ্গা-যমুনা-সরোসোতি যাচ্ছে।

ন্যাতাটানা ঘর / থাকা চাই গতর।

মাটির ঘরের কথা যখন হচ্ছে তখন তার দেওয়ালে 'কুলুঙ্গি' বা দরজা কী জানালার মাথার উপর মাটির নকশার কথাও বলতে হয় বই-কি যা অনেক সময়ই হত বেশ সুন্দর। তারপর উঠান, উঠান থেকে উঠে গেছে যে উঁচু দাওয়া (লোহার গ্রিল ইত্যাদির নামগন্ধহীন সেই সময়, সাপখোপ-জীবজন্তুর ভয়ে অনেক উঁচুই করা হত দাওয়া) — উঠান থেকে দাওয়ার কিনারা পর্যন্ত 'ছেঁচ' এবং দাওয়া, তাছাড়া দাওয়ার উপর ঘরের দেওয়ালের নীচের দিকের অংশ, ঘরের মেঝে ও ঘরের ভিতরে চারিদিকের দেওয়ালের নীচের দিকের অংশে যে গোবর দেওয়া হত তাও কম দৃষ্টিনন্দন ছিল না। পয়লা বৈশাখে, বড়োপুজো-লক্ষ্মীপুজোয়, যাদের রান্নাপুজো অর্থাৎ অরন্ধন আছে — তার পূর্বে অর্থাৎ বছরে বেশ কয়েকবার ঝাড়পোঁছ করে পুরো ঘর-উঠানই (অর্থাৎ তখন দাওয়া ও ঘরের ভিতরের দেওয়ালের মাথা পর্যন্ত) গোবর দেওয়া হত। কত সুন্দর দেখাত তখন বাড়িঘর! জলে মেশানো গোবরের ঘনত্বের ইতরবিশেষে সেই লেপনে রঙের পরতে সূক্ষ্ম তফাত আনে কেমন! একটু মাটিও মিশিয়ে নেওয়া হত অনেকসময়, বিশেষত দাওয়ার ছেঁচের দিকের নোনা-ধরে 'ফুসকে-ওঠা' অংশ নারকেলের মালা, খোলা (খোলামকুচি) ইত্যাদি দিয়ে চেঁছে ফেলে গোবর দেওয়া ইত্যাদির সময়। চাষিঘরে বলাই হয় এমন, দাবা-ঘর (বা ঘর-দাবা) গোবর-মাটি দওয়া (বা দাওয়া উচ্চারণ, অর্থাৎ দেওয়া) এ ছাড়া, লক্ষ্মীপুজো-পৌষসংক্রান্তি প্রভৃতিতে রয়েছে আলপনা দেওয়ার ব্যাপার। তা যত আনাড়িই হোক, গোবরলেপা স্থানে মূলত চালের-গুঁড়োগোলা ওই শিল্পটি ভালো লাগেই।

মাদা-ভাঁটি-ভারা/ দেখুন রূপের ধারা!

যাঁরা নিজহাতে পালং-মুলো থেকে আলুর ভাঁটি দিয়েছেন, জানেন যে, শাক-সবজির ভাঁটি দেওয়া বিশেষ করে দড়ি ধরে ধরে সমান দূরত্বে সোজা ভাঁটির সৌন্দর্য নিয়ে কারও সন্দেহ থাকার কথা নয়। আবার আলুর ক্ষেত্রে — আলু পোঁতার আগে থেকে ভাঁটি পূর্ণরূপ পেতে সময়ের ব্যবধানে তিন-চারটি পর্যায় রয়েছে। তাছাড়া কোনও চারা বেরোনো থেকে সেটি গাছের পরিণত হয়ে ওঠা পর্যন্ত তার চেহারা যায় পালটে পালটে। 'ঝাঁটি বিন' বা 'পেন্সিল বিন'- এর অনেক আগে কেবলমাত্র যে পাকাটির (পাটকাঠি) বিনের চাষ হত তার ক্রমশ-গড়ে-ওঠার মধ্যে শিল্প ও সৌন্দর্যের দিকটা ভাবুন একবার। এখন অবশ্য প্রায় দেখাই যায় না সেই দৃশ্য। তারপর, ছোট্ট ছোট্ট চারা পাকাটি-বেয়ে ঘুরে ঘুরে ওঠা থেকে ফুল-ফল ধরা, একসময় পুরো পাকাটিতে ভরে যাওয়া — সার্বিক চেহারাটাই যাবে পালটে পালটে! ধরুন, মাঠে মাদা কেটে বেগুন বা লঙ্কার চারা 'বসানো'র পর কুপিয়ে মাটি ঝুরো ঝুরো করে, ভাঁটি দিয়ে গাছকে আস্তে আস্তে বড়ো করা — তারও এক - একটা পর্যায়ে রয়েছে অসাধারণ সৌন্দর্য! শুরুর ম্যাড়মেড়ে ভাব থেকে বা চারার অসহায় ভাব থেকে ক্রমশ একসময় পুরো খেত সেজে-ওঠা বা খানিক বড়ো চারাগাছের 'ঢলঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি' চোখ ও মন ভরিয়ে দেওয়ার মতো। আর ভারার উপাদান এবং রূপ যে কত রকম, ভাবা যায় না!

কেবল বাঁশ-কঞ্চির; বাঁশের খোপার উপর লোহার তার, টায়ারের কড়, নারকেল-কাতা বা নাইলন-দড়ি ইত্যাদি টাঙিয়ে তার উপর, বিভিন্ন চাষের জন্যে বিভিন্ন রকম জাল খাঁটানো।

ঝ্যাদ্‌লা-আলটা-কেঁড়ে/যাচ্ছে ক্রমে ছেড়ে!

চাষিঘরে প্রয়োজনের কত জিনিসই যে তৈরি করে নেওয়া হত। বসার তালপাতার চাটাই তৈরি করে নেওয়া হত, অনেক সময় তালপাতার চলনসই হাতপাখাও। বৃষ্টি থেকে বাঁচতে তৈরি করে নেওয়া হত তালপাতার শার্সি। 'টাকুর'-এ কাটা পাটের দড়ি পাকিয়ে (সেও এক দারুণ দৃশ্য! দাওয়া বা অন্য কোনও ঘরের খুঁটিতে দড়িবাঁধা পাট ঝুলিয়ে, পাশে বসে, সাধারণত বাম হাতে পাটের আগা সংযুক্ত করে করে হালকা হেঁচকা টানে টেনে ছাড়িয়ে নিয়ে নিয়ে টাকুরের দড়ির মুখে জুড়ে জুড়ে ডান হাত দিয়ে ডান উরুতে টাকুর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পাকানো হয়) তাতে পোড়া মাটির 'বোঁদেল' লাগিয়ে বাঁশ ঘিরে ঘিরে শুকনো পাতিঘাসের ঝ্যাদ্‌লা (ঝ্যাতলা) তৈরি করে নেওয়া হয় বসা-শোওয়া, ধান শুকানো, ছোটোখাটো আসরে শিল্পীদের জন্যে পাতা থেকে দর্শকদের বসা-শোয়া ইত্যাদির জন্যে। এ সবের মধ্যে কাজ তথা প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে সৌন্দর্যের সহাবস্থানের ব্যাপারে, এ বিষয়ে এই সব জিনিসের প্রত্যক্ষদর্শীরা একমত হবেনই আশা করি। মাঠ থেকে কেটে-আনা 'ফুলো' পাতি, মাথার ফুল ফেলে কয়েক দিন ধরে রোদে শুকিয়ে, কলার ছোটা বা সেই পাতিরই সাহায্যে গোড়া থেকে আগার দিকে ক্রমশ-চুড়ো-করে বেঁধে পাতির যে এক-একটা গোছা করে রাখা হত তা দেখতে হত দৃষ্টিনন্দন। ঝ্যাদ্‌লা তৈরি হয়ে যাওয়ার পর, বোঁদেলগুলোও মাঝের ফুটো দিয়ে দড়ি গলিয়ে সাজিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হত একেবারে একটি মালার মতো! টুকটাক কাঠি জাতীয় (যেমন জালবোনার নানা উপকরণ) বা ছোটোখাটো জিনিসপত্র রাখা ও ইঁদুর-ধরা-বাঁশের এই দু-রকম কেঁড়ে, খড়ের ছোটা থেকে নানান আকারের খড়ের আলটা অর্থাৎ বিড়ে তৈরি করে নেয় চাষি পরিবার। টুকটাক জিনিসপত্র রাখার কেঁড়ে তৈরি করা হত ভালো ফাঁপা বাঁশের একটি 'পাউ' নিয়ে তার একমুখ গাঁটের আগে থেকে সূক্ষ্মভাবে দা দিয়ে কেটে (বা করাত দিয়ে) সেই ফাঁকা দিকটিতে প্রান্তের একটু আগে লোহার শিক পুড়িয়ে দুটি ফুটো করে দড়ি গলিয়ে টাঙানোর ব্যবস্থা করে। ইঁদুর ধরার কেঁড়ের ক্ষেত্রে, ওই ভাবেই ফুটো করার পর — এক্ষেত্রে ফুটোদুটো গোলাকার কেঁড়ের মাথার দিকের এক প্রান্তঘেঁষা করতেই হবে — লোহার মোটা তার দুই ফুটোর মধ্যে গলিয়ে আটকে তার থেকে কেঁড়ের ভিতরের দিকে লোহার মোটা তারের খানিকটা ইংরেজি 'এম' আকৃতির একটি বস্তু ঝুলিয়ে দেওয়া হয় যাতে গর্ত বা অন্য কোনও কিছুর মুখে পাতলে পর স্বচ্ছন্দে ঢুকতে পারে ইঁদুর, কিন্তু বেরোতে না পারে। কেবল দেখে দেখে দু-দিনে সুন্দর সুন্দর আলটা তৈরি সহজ নয়, তার জন্যে চাই অনুশীলন। কালীপুজোর রাতে বাড়ির সদর দরজায় দু-দিকে গাঁট-রাখা ফাঁপা কাঁচা বাঁশের আধারে, মাঝে ফুটো করে কেরোসিন তেল ভরে সলতে লাগিয়ে আলো জ্বালানো হত (ছোট্ট কাঁচা কঞ্চির টুকরো ফুটোটির মধ্যে বসিয়ে তার মধ্যে থেকে সলতে গলানো হত এবং একটু কাদা বসিয়ে দেওয়া হত বাঁশ ও কঞ্চির টুকরোটির সংযোগস্থলে)।

শিউলির হাতের শিল্প গুড়-পাটালির কাজ / ভেজাল, ওষুধ পেরিয়ে বোঝা শক্ত আজ।

আমাদের এই চাষিপাড়ার একসময় প্রায় ঘরে ঘরে কমবেশি খেজুর গাছ কাটা হত। অনেক পরিবারেই কাটা হত তালগাছও। নলেন গুড় ও তালপাটালির এই মরশুমি কাজের মধ্যে সূক্ষ্ম শিল্পের দিক যে কতখানি তা বলে বোঝানো মুশকিল। কোনও রকম ওষুধ, চিনি বা কৃত্রিম কোনও জিনিস (যেমন চায়ের লিকার) ব্যবহার না করে আগের দিনের মতো একেবারে সরাসরি খাঁটি নলেন গুড় বা খেজুর পাটালি কিংবা তালপাটালি বা তালমিছরি তৈরির মধ্যে যে পরিশ্রম, যত্ন ও সূক্ষ্ম শিল্পের দিক রয়েছে তার কথা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়! ভালো গুড়-পাটালির একাধিক শর্ত আছে। আবহাওয়া ভালো হতে হবে অর্থাৎ রস গেঁজে যাওয়া বা রসে বৃষ্টির জল বেশি না পড়া; ভাঁড় ভালো করে 'মাজা' অর্থাৎ জল সহযোগে খেজুরপাতার 'চ্যাঁচালি' (গাছের সঙ্গে যে জালি ধরে রাখে পাতাকে) বা ন্যাকড়া দিয়ে ভালো করে মাজার পর ধোয়া; ভাঁড় 'পোড়ানো' অর্থাৎ বাইরের দিকে মাঝখানে ছিদ্রযুক্ত বড় কলসি, খুলি বা মেজলার (মেছলা) মধ্যে খড়কুটি-পাতানাতা দিয়ে ধোঁয়া করে তার উপর ভাঁড় উপুড় করে ধোঁয়া খাইয়ে গরম করা; তালগাছের ক্ষেত্রে, তার আগে ভাঁড়ের মধ্যে চুন লাগিয়ে দেওয়া; খেজুরগাছের ক্ষেত্রে, তিনদিন কাটার পর তিনদিন 'জিরেন' অর্থাৎ বিশ্রাম; ভালো কাঠ দরকার যাতে রস জ্বাল দেওয়ার সময় বেশি ধোঁয়া না হয় বা ছাই না ওড়ে; রস জ্বাল দেওয়ার সময় পুরোপুরি সময় সেখানে উপস্থিত থেকে 'নাড়া' যাতে রস বা গুড় 'চুঁয়ে' না যায় (ধরে না যায় বা পুড়ে না ওঠে) ইত্যাদি। বোঝাই যায়, ভালো মানের গুড় বা পাটালি কোনও গোদা কর্ম নয়।

ধানের মাঠেই ওঠে কি কেবল ঢেউ?/ 'ধান-দেওয়ায়'ও দেখতে পাবে যে-কেউ।

পায়ে-পায়ে ঢেউ তুলে 'ধান দেওয়া' দেখেছেন? গ্রামের অনেকেই তা দেখেছেন, এখনও দেখছেন। এই ধান দেওয়া মানে ঝাড়াই-করা ধান 'ভাবানো' (ভাপানো) ও 'সেদ্দ'র (সিদ্ধ) পরে 'ঝোঁদ্‌লা' মাদুর বা চট-কাপড়-প্লাস্টিকে উঠান বা খামারে রৌদ্রে মেলে দেওয়া, 'ধান-শুকোনো'র জন্যে। তো সেই সিদ্ধ-করা ধান পাতা-ঝ্যাঁত্‌লা-মাদুর বা 'গোবর-দেওয়া' (লেপা) মাটিতে ঢালার পর, পায়ে-পায়ে ঢেউ তুলে রৌদ্রে ধান মেলে দেওয়ার একটা সৌন্দর্য আছে বই-কি! শুধু প্রথম মেলে দেওয়ার সময়ই কেবল নয়, এক পিট (পিঠ), দু-পিট দেওয়ার সময় অর্থাৎ দু-দিকে দুই কোণ করে চার কোণ তুলে ধরে এবং কোণগুলো ঝেড়ে মাঝখানে ধান ডাঁই করে তারপর আবার ঢেউ তুলে ধান দেওয়া। নিতান্ত একটি পাটা, লাঠি বা পিঁড়ে (পিঁড়ি) ইত্যাদি দিয়ে তুলনায় মসৃণভাবে ধান দেওয়ার বাইরে পায়ে পায়ে ঢেউ তোলার পর ধীরে ধীরে দু-পায়ে ঠেলে-টেনে ছড়িয়ে, চারদিকে সুচারু প্রান্ত রচনার মাধ্যমে মাঝখান পর্যন্ত পুরো ঝ্যাঁতলাটিতে সর্বত্র ধানের পরিমাণ প্রায় সমান রেখে সুচারু যে ধান দেওয়া-হালকা হালকা সূক্ষ্ম পায়ের টানের রেখা-ফুটে-থাকা সেই মেলা-ধানের সৌন্দর্য দেখার মতো! বস্তুত, অন্য কিছুর মাধ্যমে, এমনকি ছোটো বস্তা ইত্যাদিতে কেবল হাতের সাহায্যে দেওয়া ধানের সঙ্গে তফাত বোঝা যায় পুরোপুরি পায়ে-দেওয়া-ধানের। চাষি পরিবারের

বেশির ভাগ মহিলা এ বিষয়ে তুখোড় তো বটেই, অনেক পুরুষও এটিতে কম এলেমদার নয়। এই প্রসঙ্গে কুলোতে ধানচাল ঝাড়ার কথাটাও বলতে হয়। এখন ইলেকট্রিক পাখার সামনে ঝিরঝির করে ফেলে ধানঝাড়ার কাজ সেরে নেওয়া ভালোরকম শুরু হলেও একসময় তা পুরোপুরি কুলোনির্ভরই ছিল প্রায়, বড়ো জোর জোরালো হাওয়া থাকলে তাতে ধরে অনেকসময় পরিষ্কার করে নেওয়া হত ধান। কুলোয় ধানচাল ঝাড়ার দারুণ এক ছন্দ থাকে। থাকে সৌন্দর্যও, বিশেষত চাল, গম, ডাল, সর্ষে ইত্যাদি ঝাড়ার সময়। ঝাড়তে ঝাড়তে 'আগালে কাটানো' বা 'খুদ কাটানো' কী চমৎকার ভঙ্গিতেই না সমাধা হয়ে থাকে। এই কাজে মূলত মহিলাদেরই দক্ষতা সর্বাধিক, কেন-না তাঁরাই এটা করে থাকেন বেশি। কোনও কোনও পুরুষও পারেন অবশ্যই। তবে আমাদের মতো ধৈর্য-কম পুরুষরা তাড়াতাড়ি সারার অভিপ্রায়ে একসঙ্গে একগাদা চাল-গম কুলোয় চড়ানোর কারণে সুচারুভাবে সমাধা হয় না কাজটা, তাছাড়া মাঝেমধ্যে এক-আধদিন করলে সেই দক্ষতা অর্জন বা সৌন্দর্যসৃষ্টি কখনওই সম্ভব নয়।

পঞ্চানন দাস/সাবাস সাবাস!

একেবারে প্রথম অংশটি বাদ দিয়ে পরবর্তী বেশ খানিক অংশ যখন লেখা হয়ে গেছে গত জানুয়ারির ৬ ও ১০ তারিখে দু-দফায় ঘণ্টাখানেক করে বসে, সেইসময় হাতে এল পঞ্চানন দাসের একটি লেখা, ধূর্জটি নস্কর সম্পাদিত *পুণ্ড্র পৌণ্ড্র বান্ধব* পত্রিকার (জানুয়ারি ২০১৮) 'জাতকের জনকজননী কথা' কলমে। তেমন শিক্ষাগত যোগ্যতা না-থাকা বাবা ও একেবারে নিরক্ষর মাকে নিয়ে ব্যতিক্রমী অনবদ্য সংক্ষিপ্ত সেই লেখাটি থেকে খানিক উদ্ধৃত করতেই হচ্ছে: 'বাবা ছিলেন নির্ভেজাল এক কৃষিজীবী। নির্ভেজাল কথাটা বললাম এজন্য যে, তাঁর কৃষির অর্থাৎ আবাদি আগান-বাগান জমিজিরেতের সব কাজে যেমন আন্তরিকতা, তেমন নিপুণ শিল্পের ছোঁয়া। পরবর্তীকালে বড়ো হয়ে তবেই বুঝেছি এইসব শিল্পের তাৎপর্য। কৃষির প্রতিটা কাজে ফুটে উঠত অনিন্দ্যসুন্দর শিল্পসৌন্দর্য। মাটিচষা থেকে তলাপেড়ে ভাঙা, আল দেওয়া, বীজতলা রোয়া, ধানকাটা, বিচালি ও তড়পা বাঁধা, গাদাজাত করা ইত্যাদি সবকিছুতে ফুটে উঠত নিখুঁত শিল্পের ঠাস বুনুনি। বীজতলা রোয়া বা কাটা ধানের সারির মধ্যে কী যে শিল্প লুকিয়ে ছিল তা আজ বুঝি! সব সারই ছিল জ্যামিতির এক একটি সরলরেখা, সহজ-সরল ও সাবলীল ধানের বিচালি ও খড়ের তড়পাগুলো সবাই একই মার্গের, ওজনও ছিল হয়তো বা সমমাপের। খড়ের গাদাই ছিল শিল্পের এক অখণ্ড রূপ। ... এই খানাকাটার মধ্যেও ছিল হাতের মোক্ষম জাদু। কোদালে কাটা প্রতিটা চাপড়া যেমন নিখুঁত, গাঁথুনিও তেমন। এভাবে মাটির দেওয়াল ও খড়ের চালে দেখা যেত শৌখিন কারুকার্য। ... পথচলতি মানুষ পথ চলত শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বাগানের দিকে তাকিয়ে। উপায় থাকত না কারুর এড়িয়ে যাবার। সবজির খেত, সবজির প্রতিটা খোপ দর্শনীয় চিত্রপট। নটের চাটির কথা আজও মনে পড়ে। কত রকমের নটে, কত বর্ণের! যেন নটের গালিচা!' তাঁর মায়ের কাঁথা সেলাইয়ে শিল্পের ছোঁয়া ছিল বলে জানিয়েছেন শ্রী দাস। [কৃষ্ণের শতনাম, লক্ষ্মীর পাঁচালি, রামায়ণ ও মহাভারতের বহু পদ ও বিশেষ চরিত্রের সংলাপ ছন্দে ও সুরে মুখস্থ বলতে পারার ব্যাপার তো ছিলই]

সেলাই করা কাঁথা/ কাজটা নয়কো যা-তা

মাটির দাওয়ায় ঝেঁদ্‌লা বা হোগলার মাদুরের উপর পুরোনো কাচা ধুতি বা সাদা কাপড়-পাতা সেই ধবধবে সৌন্দর্য ভুলতে পারব কী কোনওদিন! কিংবা রঙিন পুরোনো বা ছেঁড়া শাড়ির। সাধারণত জমিতে রোয়ার কাজ শেষ হয়ে গেলে, ভাদ্রমাসের দিক থেকে কার্তিক পর্যন্ত মাঝারি বা বড়ো বড়ো 'কাঁথা বসানো' বা পুরোনো বা ছেঁড়া-খোঁড়া কাঁথায় 'ঢাকা দেওয়ার কাজ চলত (আর কোনও মহিলা পোয়াতি হলে পর, তিনি নিজে বা তাঁর শ্বাশুড়ি বা মা আগেভাগে তৈরি করে নিতেন যথেষ্ট সংখ্যক ছোটো ছোটো কাঁথা)। মূলত নারীরাই করত এই শিল্পকর্মটি। পিছিয়ে থাকত না কোনও কোনও পুরুষও। তুলনায় বেশি শক্ত থাকে বলে প্রথমে শাড়ির পাড়গুলো পুরোনো বা ছেঁড়া কাপড় থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া হয়। পা ছড়িয়ে বসে পায়ের বুড়ো আঙুলে সেই পাড় জড়িয়ে ধরে তার থেকে তিন-চার 'খে' (এক-একটি স্বতন্ত্র সরু সুতো) একত্র ধরে তুলে তুলে গুটিয়ে গুটিয়ে বিভিন্ন রঙের এক-একটা ছোটো ছোটো বলের আকার দেওয়া হত। কাঁথার জন্যে পাতা-কাপড়ের উপর রাখা সেই রঙিন বলগুলি কম দৃষ্টিনন্দন ছিল নাকি! তারপর বিভিন্ন রঙের সুতো দিয়ে বিভিন্ন মাপের সুচের সাহায্যে সাধারণ থেকে অসাধারণ যে-সব শিল্পকর্ম উঠে আসে কাঁথার উপরে তা আমাদের অজানা নয়। এমনই কিছু অনবদ্য অপূর্ব কাঁথা — যা তাদের সৃষ্টিকর্ত্রীদের কাছে ছিল নিতান্ত সহজ সাধারণ আনন্দের এক কাজ, কতিপয় সমঝদার গুণীর মাধ্যমে নকশি কাঁথা বলে মানুষের দরবারে প্রকাশ ও প্রচার পেল (কাব্য ও কথার বুননে অসামান্য বাংলাভাষার বহুমান্য ঠাকুরটিও এ-সবের প্রতি কম আগ্রহী ছিলেন না — দেননি কম উৎসাহ)। লোকে আবিষ্কার করল তার অনন্যতা। জসীমউদ্দীন অমর করে রাখলেন 'নকশিকাঁথার মাঠ' কাব্যে। যন্ত্রচালিত 'রেডিমেড'-এর দিনে আবার আমরা চাষিঘরে হারাতে বসেছি সেই অপরূপ শিল্পমাধ্যমটি। আসন-বোনার দিনও তো কবেই কাবার প্রায়।

কুঁচিকাঠি, ঝাঁটা /হবে চক্ষু ভাঁটা

নারকেল পাতার কাঠি থেকে ঝাঁটা হয় কত রকমের। একেবারে পূর্ণ দৈর্ঘ্যের পাতার কাঠি (কাঁচা পাতা বঁটিতে 'চাঁচা'র সময় সুন্দর একটা শব্দ হয়) থেকে হয় 'পালা-ঝ্যাটা'। ঘর-দোর ঝাঁট দেওয়া থেকে 'উটোন-কাটান' অর্থাৎ উঠান-খামার ইত্যাদি পরিষ্কার করার পর তাতে ঘন-করে-গোলা গোবরজল, নরম দীর্ঘ গুচ্ছ আগা দিয়ে মাটিতে ধরিয়ে ধরিয়ে দেওয়ার কাজে এ অদ্বিতীয়। এর পর আছে 'মুড়ো-ঝ্যাটা'। পালা-ঝাঁটা ব্যবহার করতে করতে আগা ক্ষয়ে ক্ষয়ে ছোটো হয়ে খোঁচা খোঁচা হয়ে গেলে তা মুড়ো-ঝাঁটায় পরিণত হতে পারে; আবার মাঝখান থেকে পাতা ভেঙে গেলে, চাঁছার সময় মাঝখানে গিয়ে কাঠি কেটে গেলে এমন সব আগাহীন কাঠি দিয়ে এই ঝাঁটা তৈরি হতে পারে যা 'গোলকাড়া' (গোয়াল পরিষ্কার করা) কিংবা 'কাঁকর-কুরুই' সহ 'ঝাল্লে-কুল্লে' বা 'ঝাল্লে-মাটি' পরিষ্কার করার পক্ষে আদর্শ। এর মধ্যে ঘর ঝাঁট দেওয়া এবং গোলকাড়ার জন্যে থাকত স্বতন্ত্র ঝাঁটা, এ-দুটি সাধারণত অন্য কাজে ব্যবহার করা হত না। নারকেলের 'ডাগ'-এর

আগার দিকের তুলনায় ছোটো পাতাগুলোর কাঠি দিয়ে তৈরি হত কুঁচিকাঠি, বাছাই-করা কাঠির দু-তিন আকারের। মুড়ির চাল 'ওনচানো' (উচ্চারণ 'ওঞ্চানো') এবং মুড়িভাজার আলাদা আলাদা কুঁচিকাঠি লাগে। তাছাড়া খইভাজা, পিঁড়ের উপর ফেলে মুগকড়াই ভাঙার আগে তা 'চোঙ্কানো' ইত্যাদির প্রয়োজনে বাড়িতে দু-দিন আকারের কুঁচিকাটি প্রস্তুত থাকত। ঝাঁটা বাঁধায় দক্ষতাও লাগে কিঞ্চিৎ যাতে কাঠি সহজে বেরিয়ে না যায়। ঝাঁটা বাঁধা হয় গোড়ার দিকে; কুঁচিকাঠি বাঁধা হয় তুলনায় আলগা করে এবং গুচ্ছকাঠির প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় যাতে কিছু ভাজা ইত্যাদির সময় কাঠিগুলোকে হাতের মধ্যে চওড়া করে নেওয়া যায়। কোঠাবাড়ির প্রাচুর্য এবং প্যাকেটজাত বা দরজায় দরজায় পৌঁছে-যাওয়া মেশিনের মুড়ির এইদিনে পালা বা মুড়ো ঝাঁটার দিনও যেমন কমে যাচ্ছে তেমনই কুঁচিকাঠি আর কতটুকু টিকে আছে কে জানে!

লম্বা হচ্ছে লেখা/ সংক্ষেপে যাক দেখা

মুড়ির কথা যখন উঠল, 'মুড়িখোলা'র কথা বলতেই হয়। লোকে সাধারণত তাকে ভাজনাখোলার মধ্যেই ফেলে। নীচের দিক থেকে মাটির হাঁড়ির মাঝখানের পরে শুরু-হওয়া হেলা অংশের অর্ধেকটা অর্ধচন্দ্রাকারে কেটে তুলে দেওয়া হত কাস্তেজাতীয় কিছু দিয়ে যাতে সামনের দিক থেকে অনায়াসে মুড়ি-খই ভেজে তোলা যায় কিন্তু পিছনের অর্ধেক অংশ কাটা না থাকায় ঠিকরে পিছনে পড়ে না যেতে পারে মুড়ি বা খই। সুন্দর কার্যকর এই জিনিসটির জায়গায় পরে কেবল কড়াইতে ভাজা শুরু হল। ধানসিদ্ধ করা হত বড়ো বড়ো মাটির হাঁড়িতে বা অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়িতে। চুড়ো করে ধান দেওয়ার পরেও — যার পরে আর ধরবে না — প্রতি হাঁড়িতে অনেকখানি বাড়তি করে ধান ধরিয়ে দেওয়া হয় আরও আরও চুড়ো-করে-ধান-তুলে সেই চুড়োর গায়ে ভিজে কাপড় জড়িয়ে দিয়ে। একটাও ধান সটকে পড়তে পারবে না। 'দড়িভাঙা' বা বিশেষ করে বেশ কয়েক দিনের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিউলিদের 'কাছিভাঙা' নেহাত কম দক্ষতার কর্ম নয়! পাক এমন স্তরের হয়, কাছি তো বটেই সাধারণ মোটা দড়িও দু-এক ফুট কাঠির মতো কেমন দাঁড়িয়ে থাকতে পারে হাতের উপর! চাষিঘরে জালবোনার পুরো প্রক্রিয়াটাই হত নিজেদেরই হাতে, কেবল একেবারে সবচেয়ে সরু সুতোর 'নেচি' হাট থেকে কিনে আনা ছাড়া। চেড়ার তৈরি চরকার মতো একটি জিনিসের গায়ে সেই নেচি জড়িয়ে তিন-চার 'খে' একসঙ্গে করে ধরে সংগ্রহ করে নিয়ে পরে সুতো পাকানো থেকে 'জালবাড়ি'তে নাল ইত্যাদির বিভিন্ন রকমের জাল বোনা। নির্দিষ্ট স্থানে স্থানে 'মালি' দিয়ে গেলে তবেই জাল ক্রমশ বিস্তৃত হবে। 'ছাগুন জাল' বা 'ছাগ্‌নি জাল' হয়ে যাবে এক দফায়, আর ছোটো বা বড়ো মাছের আলাদা আলাদা খেপলা জাল হবে আলাদা আলাদা করে 'পাটা' বোনার পর তা জুড়ে জুড়ে। তার নীচে হবে 'ঘাল' এবং তাতে থাকবে লোহার 'কাঁটি' - যাকে 'জালের কাঁটি'ও বলা হয়। সুতো ও কাঁটি ছাড়া এই প্রতিটি উপকরণই ঘরে তৈরি করে নেওয়া হত। এমনই দক্ষতা এক-একজনের, রাতের অন্ধকারে অন্যের সঙ্গে গল্প করতে করতে অনায়াসে জাল বুনে যেতে পারেন অনেকেই। ধানের 'পুঁড়ো' তৈরি করে তাতে বীজধান ভরে গোলায় তুলে রাখা হত আমাদের, পরের দিকে বস্তাতেই রাখা হত অবশ্য। এই পুঁড়ো পুরোপুরি

খড় দিয়েই তৈরি হত — গোটা খড়ের অনবদ্য এক বোঁচকা যেন! ছোটো-বড়ো বিভিন্ন আকারের গোল ভালো নারকেল কী মসৃণ করে ছাড়াতাম আমরা দা দিয়ে, পায়ের অগ্রভাগে চেপে ধরে, বিশেষত যখন তা থেকে রস জ্বাল দেওয়ার বা ডাল ঘাঁটার বড়ো, মাঝারি বা ছোটো 'উঁড়কিমালা' তৈরি করা হত! পাকা তেঁতুল ছাড়িয়ে বাজারের জন্য কলাপাতায় কী সুন্দর করে সাজিয়ে বাঁধত বাবা! আমরাও শিখেছিলাম।

অনবদ্য সুভাষ / কথায় ছড়ায় সুবাস

'কাজ আর সৃষ্টি। প্রক্রিয়ার দিক থেকে দুইয়ের খুব একটা ফারাক নেই। যা-নেই তা পাওয়ার জন্যে, যা- আছে তার নড়চড় ঘটানো। কারিগর কাজ করে, লেখক করে সৃষ্টি। দুইয়েরই জাত এক।' অন্য এক প্রেক্ষিতে লিখেছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় ('শিশুর মন গড়ার কাজে শিশুসাহিত্য', *কথার গুণে তরি কথার দোষে মরি*, অভিজাত প্রকাশনী, বৈশাখ ১৪০৫) অনায়াস একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন: 'তাঁতি কীভাবে কাজ করে দেখা যাক। তাঁতি, তাঁত, সুতো — এই তিন একঠাঁই হওয়া চাই। ধুতি, শাড়ি বা গামছা — কোনটা করতে চায়, মনে মনে আগে সেটা এঁচে নিতে হবে। কাজ শুরু এবং শেষ করতে হবে মাঝখানে ছেড়ে দিলে চলবে না। সমানে টানাপোড়েনের ভেতর দিয়ে তৈরি করে তাঁতির মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। উদ্দেশ্য থাকবে চাপা, কখনওই তা নিজেকে জাহির করবে না। নিজের পছন্দমতো হলে কাজেও ছিরিছাঁদ থাকে।' লিখেছেন, 'শরীরমনের জড়তা কাটাতে সাবেককালে ছিল নাচের সঙ্গে গান আর খেলার সঙ্গে ছড়া। জ্যান্ত জীবন থেকে সরিয়ে, তাতে লোকসাহিত্যের ছাপ মেরে, আমরা তাকে জাদুঘরে ঠেলে দিয়েছি।'

অবনীন্দ্র দিলেন রায়/ *ঘরোয়া*-য় সহজ ভাষায়

'দেখো, শিল্প জিনিসটা কী, তা বুঝিয়ে বলা বড়ো শক্ত। শিল্প হচ্ছে শখ। যার সেই শখ ভিতর থেকে এল সেই পারে শিল্প সৃষ্টি করতে, ছবি আঁকতে, বাজনা বাজাতে, নাচতে, গাইতে, নাটক লিখতে — যাই বলো।... একালে যেন শখ নেই, শখ বলে কোনো পদার্থই নেই।একালে সবকিছুকেই বলে 'শিক্ষা'। সব জিনিসের সঙ্গে শিক্ষা জুড়ে দিয়েছে। ছেলেদের জন্য গল্প লিখবে তাতেও থাকবে শিক্ষার গন্ধ। আমাদের কালে ছিল ছেলে-বুড়োর শখ বলে একটা জিনিস, সবাই ছিল শৌখিন সেকালে, মেয়েরা পর্যন্ত — তাদেরও শখ ছিল।... শখের আবার ঠিক রাস্তা বা ভুল রাস্তা কী। এর কি আর নিয়মকানুন আছে। এ হচ্ছে ভিতরকার জিনিস, আপনিই সে বেরিয়ে আসে, পথ করে নেয়। তার জন্য ভাবতে হয় না। যার ভিতরে শখ নেই, তাকে এ কথা বুঝিয়ে বলা যায় না'' (অবনীন্দ্র রচনাবলী, প্রকাশ ভবন, জানুয়ারি ১৯৭৩, মাঘ ১৩৭৯। *ঘরোয়া* প্রকাশিত হয় ১৩৪৮ সালের আশ্বিন মাসে। প্রকাশ করে বিশ্বভারতী। এটির লিপিকর রানী চন্দ।)

বিষ্ণু দে/বলেন যে,

'আজও দেশে এমন লোক আছেন যাঁরা সত্যিই এই দুর্গত দেশের সাধারণ মানুষের সংস্কৃতির বিষয়ে মনস্থির করতে পারেন না, কেউ বা দূর-থেকে-দেখার, উপর-থেকে শোনার বদান্য কৌতূহল নিয়ে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক সন্ধ্যা কাটিয়ে যান। তার চেয়ে বেশি কাটানোও শক্ত, কারণ দুয়ের মধ্যে ঘরদোর খাওয়াপরা জীবনযাত্রার সব কিছুতেই ফারাকটা দুস্তর। আবার কেউ কেউ গ্রাম্যশিল্পীর পৃষ্ঠপোষণ করে থাকেন, ... তাতে না থাকে শ্রদ্ধা, না থাকে আন্তরিকতা, ফলে উভয়পক্ষে কারোই লাভ হয় না — এক ব্যাবসার দিক থেকে ছাড়া, এবং শিল্পের মুরুব্বি হওয়া ছাড়া।' (এলোমেলো জীবন ও শিল্প-সাহিত্য, ইস্ট অ্যান্ড কোম্পানি) বলছেন: 'লোক সংস্কৃতির মূল্য আমরা যেন দিই নিজের গরজে, প্রাণের দায়ে; পৃষ্ঠপোষক বা সংগ্রাহক বা নৃতাত্ত্বিক সেজে বা দেশ-বিদেশে ব্যাবসার তাগিদে নয়। ... লোক-সংস্কৃতি নবজীবন পাবে জনসাধারণের সংস্কৃতিতে। তাতে যোগ দিয়ে সঙ্গগুণে মুক্তি আমাদেরও ভরসা।'

তবুও, উপরোক্ত তিন বিশিষ্টের কথাগুলি মূলত কারুশিল্প বা কুটিরশিল্প কিংবা হস্তশিল্প এবং শিল্পের অন্যান্য নানান রূপ সম্বন্ধীয় কথা। কাজের হাত-ধরে, প্রয়োজনের পথ বেয়ে নিত্য জেগে ওঠে যে শিল্প আবার মিলিয়েও যায় প্রায় নিত্য-নিত্য বা এক মরশুমে, তার কথা তেমন করে ঠাঁই পায়নি শিল্পকথার অভিজাত আঙিনায়। সেই চাষিঘরের একজন হয়ে, সেইসব অনেক কাজের সঙ্গে আজন্ম বহুদিন যুক্ত-থাকা কয়েকটি কথা তুলে ধরার চেষ্টা করলাম এখানে।

মাঝে মাঝে কেমন মনে হয় / চাষি কম বড় দার্শনিক নয়!

একসময়ের বড়ো যৌথ পরিবারের বা তুলনায় এখনকার বড়ো পরিবারের সদস্য ও আত্মীয়স্বজন-বন্ধুবান্ধব; পালা-পোষা গরু-মোষ-ছাগল-ভেড়া, কুকুর-বিড়াল, হাঁস-মুরগি ইত্যাদি; সর্বোপরি নিজেদের লালিত-পালিত দু-চার মাস বা বছরের শাকসবজি, ফলপাকড়ের গাছ থেকে দু-চার পুরুষের গাছপালার জন্ম, বেড়ে-ওঠা, অসুস্থতা, আক্রান্ত-হওয়া, ভেঙে-পড়া, মৃত্যু — এতকিছুর সাক্ষী সত্যিই চাষির মতো আর কেউ হয় না। নাগরিক জীবন তো আরও দূর-অস্ত, বিশেষত চাষের খেতে নিজের অজস্র সৃষ্টির জন্ম, বেড়ে ওঠা, বয়স হওয়া, শেষ হওয়া মরশুমে মরশুমে দেখছে যে চাষি তার তুলনায়! সে যেন জন্ম-দার্শনিক! বাড়িতে ছেলেমেয়ে-বউমা-নাতিনাতনি (হয়তো মেয়ের-ঘরের একটিও থাকে), বৃদ্ধ বাবা-মা, পিসিমা আর বাড়ির বাইরে পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন-বন্ধুবান্ধব ও তাদের নানান ঝক্কি-ঝামেলা, সমস্যা ইত্যাদির মধ্যেও প্রৌঢ় কোনও চাষি 'বেলান্তে' করে মাঠে খেটে এসে পাড়ার প্রান্তে অবস্থিত মন্দিরের চাতালে একটা গামছা বিছিয়ে অথবা না-বিছিয়ে পরম নিশ্চিন্তে যখন ঘুম দেন অবেলায় সেলাম জানাতে ইচ্ছা করে তাঁকে।

এবার তবে কলম রাখি তুলে/না লাগলে ভালো শীঘ্র যান ভুলে

হ্যাঁ, আরও অনেক ক্ষেত্রের মতো, চাষিঘরের এই বিভিন্ন শিল্পের ক্ষেত্রেও নিশ্চয়ই রয়েছে গোদা থেকে চলনসই হয়ে শিল্পিত হাত। শিল্পী সবাই হন না। আর বিশেষত চাষের কাজ প্রচণ্ড পরিশ্রম ও তৎপরতার বলে, দক্ষতা থাকলেও, শিল্পিতভাবে কাজ সারার সুযোগ-সুবিধা হয় না সবসময় (এতটাই এই পরিশ্রম যে, অনেকসময় হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন অনেকে বা বিকল্প জীবিকা পেলে সেদিকে পা বাড়ানোর জন্য উদ্গ্রীব হয়ে থাকে)। তবু তার মধ্যেই অনেক সময়ই ফুঠে ওঠে শিল্পরূপ। আর সুদক্ষচাষি যদি যথেষ্ট সময় নিয়ে ধীরে সুস্থে তাঁর কাজটি করার সুযোগ পান তবে অনেক ক্ষেত্রেই সে কাজে সৌন্দর্যের, শিল্পের আঁচ অবশ্যই পাওয়া যায়। আরও একটা কথা বলতেই হয়। এই সমস্ত কাজে পুরুষের সঙ্গে নারীরও অংশগ্রহণ ও দক্ষতা হেলাফেলার ছিল না কোনওদিনই। লেখাটিতে অনেকসময়ই অতীতের ক্রিয়াপদ ব্যবহার করতে হয়েছে ঠিকই, কিন্তু এ-সবের কিছু কিছু এখনও বর্তমান নিশ্চয়ই। তবে আধুনিক নানান প্রযুক্তি এবং তজ্জাত দ্রব্যসামগ্রীর দৌলতে সে-সব যে ক্রমক্ষীয়মাণ তা স্বীকার করতেই হয়।

কবি সুবীর মণ্ডল ঃ একটি প্রয়াণলেখ

প্রবীর মণ্ডল

সহ্য হয় না তুলসীপাতা

একজন পুরোপুরি কবিতা-পাগল মানুষকে অত্যন্ত কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। দুখি মরিচঝাঁপির প্রান্তবাসী অন্যতম দ্বীপের নাম সাতজেলিয়া। এক্কেবারে নোনা-জলহাওয়া আর জঙ্গলের নিবিড় সান্নিধ্যে বেড়ে ওঠা একজন মানুষের মধ্যে কীভাবে যে কবিতার বীজ প্রোথিত হয়েছিল – ভেবে অবাক হই। একেই কী বলে সহজাত বা জন্মগত বা ঐশ্বরিক ক্ষমতা? জানি না। নাকি বেদব্যাস ব্যাসদেব - এর দুঃখিত ''মা নিষাদ'' শ্লোকের কথা নিয়ে চিন্তামগ্ন থাকব। অর্থাৎ ক্যান্সার নামক দস্যুর হাতে সেই যে মায়ের মৃত্যু হল, তারপরেই কি সুবীর মণ্ডল হাতে কলম তুলে নিল? হয়ে উঠল বাংলা কবিতার অবিসংবাদী এক কবি। যে মানুষটার নাম উচ্চারিত হবে প্রবীণ-নবীন, এবাংলা-ওবাংলা কবিকুলের মুখে। এভাবে আদর করে সবাই কাছে টেনে নেবেন ভাবিনি! পুলকিত হই যে, সুবীর মণ্ডল আমার দাদা। যে মানুষটির সান্নিধ্য নিয়ে আমিও ভূতগ্রস্ত কবির লড়াই-এ ভোলা ময়রা হয়ে উঠছি। অথবা বলতে পারি এমন করে, রবি ঠাকুর একদিন তাঁর জোব্বাখানি একটানে খুলে সেই যে দাদার গায়ে পরিয়ে দিয়েছিল। তারপর আমার গায়ে হয়তো বা আমার সন্ততিও একদিন ... মহাকবিতার মতো একটা রিলে-রেস।

কবি সুবীর মণ্ডল মাকে নিয়ে অজস্র কবিতা লিখে ফেললেন। যন্ত্রণা-বিদ্ধ কবি লিখলেন —

আমার মায়ের চোখ থেকে তুলসীপাতা
সরিয়ে নাও
সহ্য হয় না

ভাইটা এখন
খেতে বসেছে আসন পেতে
আমার মাকে দেখতে দাও
দেখতে দাও

ভাতের থালা হাতে আমার লক্ষ্মী বোন
আমার মাকে দেখতে দাও
দোহাই তোমার

আমার মায়ের চোখ থেকে তুলসীপাতা
সরিয়ে নাও
সহ্য হয় না।

এহেন দৃশ্যের মুখোমুখি হলে, তুলসীপাতা কারও কি সহ্য হয়? দাদারও সহ্য হয়নি। বিশেষত আমি তখন ছোটো। মাত্র সাত আর দিদি পনেরো। নিমতলার গনগনে চুল্লির মধ্যে মাকে রেখে — সাদাথান গায়ে মুড়িয়ে গ্রামে এল দাদা। এ দৃশ্য আমাকে ভাবায়নি। শুধু ২৩ ডিসেম্বর ২০১২ দাদার মতো আমারও মনে হল —

আমার দাদার চোখ থেকে তুলসীপাতা
সরিয়ে নাও
সহ্য হয় না

অসহায় বাবার চোখে জল পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা
আমার বাবাকে দেখতে দাও
দোহাই তোমার

বউদির ওই গোল-মুখ থেকে
সিঁদুরের ফোঁটা মুছে দিও না
সহ্য হয় না

আমার দাদার চোখ থেকে তুলসীপাতা
সরিয়ে নাও
সহ্য হয় না

পাউড় : সুবীর মণ্ডলের একমাত্র উপন্যাস

দৈনিক আবার যুগান্তর পত্রিকার রবিবারের 'আজ রোব্বার' - এর একটি সংখ্যা আমার দাদা সুবীর মণ্ডলকে নিয়ে প্রকাশের উৎসাহ দেখায়। তখন 'আজ রোব্বার'-এর সম্পাদক ছিলেন দেবাংশু চক্রবর্তী। দেবাংশুদা সুবীর মণ্ডলের 'লাইফ লাইন' কাব্যটি পড়ে মুগ্ধ হন। এই মুগ্ধতার খাতিরে 'আজ রোব্বার — লাইফ লাইন' নামক একটি সুবীর মণ্ডল বিষয়ক বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছিল। এই সংখ্যায় অনেক বিশিষ্ট কবি সুবীর মণ্ডলের নানা কর্মকাণ্ডের উল্লেখ করেন। শুধু সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় যে কথাকয়টি বলেছিলেন, সেই কথাগুলি পাঠক আপনাদের একটু পড়াতে চাই — '*দেখ আমার থেকে কমবয়সি কোনও লেখক বা লেখিকার যদি এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয় তাহলে আমার মনটা ভেঙে যেতে চায়। আমারই তো এদের সকলের থেকে আগে যাওয়ার কথা। তরুণ কবি সুবীর মণ্ডল যথেষ্ট প্রতিভাবান, বহু জায়গায় প্রকাশিত হয়েছে তার কবিতা। দীর্ঘদিন বেঁচে থাকার জন্য সে মনোনীত এই আমার মনে হত। অথচ তাকে কঠিন রোগের শিকার হতে হয়েছে। আমার আয়ুর থেকে তাকে কিছুটা দিতে পারলে তবু আমি কিছুটা স্বস্তি পেতাম। এই রোগের সঙ্গে লড়াই করে সে এখনও জিতে যাক এটাই আমার প্রার্থনা।*' সুনীল গাঙ্গুলির এই

নিষ্পাপ শব্দকটি পড়ে দাদার মুখে হাসি ফুটে ওঠে। দাদার মধ্যে বেঁচে থাকার অভাবনীয় উদ্দীপনার অভিব্যক্তি লক্ষ করি। অবশ্য তিনি এর কিছুদিন পরে ২৩.১০.২০১২ তারিখে মারা যান। আর দাদা মারা যায় ২৩.১২.২০১২ তারিখে। অর্থাৎ একই তারিখ ২৩। মৃত্যুর শিয়রে বসে থাকা দাদা সুনীল গাঙ্গুলির মৃত্যুকে মেনে নিতে পারেনি। মৃত্যুর কিছুদিন আগে ঢাকুরিয়া মধুসূদন মঞ্চের সামনে, হঠাৎ একদিন সন্ধের দিকে লক্ষ করি সুনীল গাঙ্গুলিকে। তিনি ভুজিয়াওয়ালার থেকে ভুজিয়া কিনে খাচ্ছেন। ভোজনরসিক ছিলেন তিনি। দাদার একমাত্র উপন্যাস 'পাউড়' পড়ে এ-ফোর সাইজের চারপাতা জুড়ে উচ্চ প্রশংসা করেন। তিনি জানাতে ভোলেননি, বাংলার উপন্যাসের ইতিহাসে সুন্দরবনকেন্দ্রিক উত্তমপুরুষে বর্ণিত 'পাউড়' একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। ভাবতে ভালো লাগছে, ২০১৪ কলকাতা বইমেলার শেষদিনে 'অভিযান পাবলিশার্স' 'পাউড়'-এর দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশ করে। প্রসঙ্গত জানাই, 'আজ রোব্বার'-এ শ্যামলী আচার্যের আলোচনা পড়ে, একজন চিত্রপরিচালক 'পাউড়' নিয়ে সিনেমা করবার উৎসাহ প্রকাশ করেন। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য যে সেই পরিচালক বন্ধুটির সঙ্গে দু-দুবার ফোনে কথা হলেও মুখোমুখি দেখা আর হল না। কারণ দাদা তখন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। আমরা সবাই সে সময় দাদাকে নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম। এই উপন্যাস নিয়ে একটি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। সে সময় দু-পাঁচ দিন অন্তর উপন্যাসের এক-একটা পরিচ্ছেদ লেখা হচ্ছে। আর দাদা সেই পরিচ্ছেদগুলি পড়ে শোনাচ্ছে আমাদের; মানে বউদি, আমি অথবা অন্যান্য কবি বন্ধুদের। একবার দাদা তার বন্ধু অভিজিৎদাকে শোনায়। অভিজিৎবাবু তখন দাদার কমলাপুর কমলা বিদ্যাপীঠ-এর শিক্ষক। এহেন বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক দাদার এই অসমাপ্ত উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি নিয়ে (তখন অবশ্য শেষ হতে আরও তিন-চারটে পরিচ্ছেদ বাকি) জানান, আমি এটি দেবেশবাবুকে পড়াব এবং আরও অনেককে পড়াতে চাই। আমাকে ডাইরিটা দেওয়া হোক। দাদা রাজি ছিল না। কারণ এর কিছুদিন আগে শিয়ালদহগামী ট্রেন থেকে গাড়ি বালিগঞ্জে ঢোকার আগেই ছিনতাই হয়ে যায়, সম্পূর্ণ থিসিস পেপারের যাবতীয় ডায়েরি। গবেষণার বিষয় ছিল সুকুমার রায়ের ছড়া। দাদা ভয়ংকর কষ্ট পায়। অভিজিৎবাবু প্রায় জোর করেই উপন্যাসটি নিয়ে যান। কিন্তু বেশ কিছুদিন হয়ে যাওয়ার পরেও তিনি আর ডায়েরিটা ফেরত দিতে চাইছিলেন না এবং জানালেন যে সুবীর তোকে আর উপন্যাসটা ফেরত দেব না। এই ঘটনা যেদিন ঘটল স্কুল থেকে ঘরে ফিরে এসে বাচ্চাদের মতো অসহায়ভাবে কাঁদতে শুরু করে দাদা। জানতে চাইলে দাদা জানায়, অভিজিৎদা উপন্যাসটি কোনওদিনই আমাকে আর ফেরত দেবে না। এর ঠিক দুদিন পর, চুরি করে দাদা ও সমুদ্র দা (বিশ্বাস) যোগাযোগ করে অভিজিৎবাবুর মায়ের সঙ্গে। একদিন ভোররাতে গিয়ে উপস্থিত হয়। মাসিমা জানিয়েছিলেন আমার ছেলেও একজন বিশিষ্ট লেখক। (সে সময় 'প্রতিক্ষণ শারদীয়া'য় প্রায় প্রতিবছর তাঁর উপন্যাস প্রকাশ হত) একটা লেখা লিখতে যে কী যন্ত্রণা আমি বুঝি, উপন্যাসটি সুবীর চুরি করে তোমার হাতেই তুলে দিচ্ছি — আমি জানি, ঘুম থেকে উঠে আমাকে হয়তো মারধোরও করতে পারে। তোমার উপন্যাসটি নিয়ে তুমি এখনই পালিয়ে যাও। দেরি করলে কোনও বিপদ ঘটতে পারে। ও হয়তো আর কিছুক্ষণের মধ্যেই উঠে পড়বে। মদ্যপ ছেলে অধিক রাতে পড়াশুনা আর লেখালেখির পরে ঘুমায়। তোমরা আর থেকে না হয়তো উঠে পড়বে এখনি। তোমরা পালাও। দাদার পরম সৌভাগ্য যে উপন্যাসটি খোয়া গেল

না।

এরপর উপন্যাসটি যখন সম্পূর্ণ হয়ে উঠল – নতুন সমস্যা তৈরি হল, উপন্যাসটির প্রকাশ নিয়ে। দাদা তখন 'দিশা'র কবিতা-বিভাগ সম্পাদনা করত। 'দিশা' উপন্যাসটি শারদ-সংখ্যায় প্রকাশ করতে চাইল। কিন্তু বিতর্কিত কিছু জায়গা তারা সম্পাদনা করবার কথা জানায়। দাদা মানতে নারাজ। সুতরাং 'দিশা'-তে 'পাউড়' ছাপা হল না। যা হোক অনেকেই আগ্রহ দেখালেও উপন্যাসটি কাউকে আর ছাপতে দেওয়া হয়নি। সরাসরি অভিযান পাবলিশার্স অর্থাৎ আমার বন্ধু মারুফ এই উপন্যাসটি বই হিসাবে প্রকাশ করে। অবশ্য পরবর্তী সময়ে মারুফ-ই দাদার নির্বাচিত কবিতার প্রকাশক হয়। আমাদের পরিবার চিরকৃতজ্ঞ মারুফের কাছে। আগামীতে আরও কৃতজ্ঞ হব, সুবীর মণ্ডলের সমস্ত লেখা নিয়ে খণ্ডে খণ্ডে যদি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন।

পুনশ্চঃ আমার নিজের একটা গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র এ উপন্যাসে অঙ্গীভূত আছে।

লেখালেখির বাপ-মা

কবিতাভাবনা বিষয়ক দাদার একটি প্রবন্ধ 'ফান্দে পড়িয়া বগা...' প্রায় বছর দশেক আগে প্রকাশিত হয়। লেখাটি ঠিক কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তা আজ মনে পড়ছে না। তবে এই প্রবন্ধের মধ্যে অনেক মান-অভিমানের প্রসঙ্গ ছিল। ধরা যাক, ও লিখেছে – ''আজ্ঞে হ্যাঁ, আর দশজনের মতো আমাদেরও লেখালেখির বাপ-মা আছেন, ঠাকুরদা-ঠাম্মা, তাদের বাবা-মা, তাদেরও ....।' বিষয়টি হল, বাংলা কবিতার নয়ের দশকে বিশিষ্ট কিছু কবি এবং সম্পাদক আর একটা -দুটো বাণিজ্যিক ও ছোটো পত্রিকাকে ঘিরে, নয়ের কিছু কবিদের মধ্যে বিশেষ উত্তেজনা-উদ্দীপনা লক্ষ করতাম। এই ন্যক্কারজনক দৃশ্য হাস্যকর ও লজ্জাজনক হলেও, কিছু কবিদের মধ্যে এমন প্রবণতা ছিলই। যে প্রবণতা সুবীর মণ্ডলের মধ্যে ছিল না। সুবীর মণ্ডলের মধ্যে যেটা ছিল বোধবুদ্ধি, মেধা আর কলমের জোর। দাদা যখন মৃত্যুর থেকে মাত্র তিন মাস দূরে, ৩১ আগস্ট, ২০১২; বাংলা আকাদেমিতে ওর নির্বাচিত কবিতা প্রকাশ উপলক্ষ্যে, ও মাত্র কয়েকটি শব্দ জড়ানো গলায় বলেছিল —'আমার কবিতাই আমার পরিচয়।' নয়ের যারা আজও লিখছেন কেউ কেউ, তাঁদের কারও কারও গলায় দশ বছর আগেও সরকারি বা বেসরকারি পুরস্কার জুটলেও সুবীর মণ্ডলের বলার মতো উল্লেখযোগ্য পুরস্কার জোটেনি। জোটেনি — কারণ সান্নিধ্য গড়ে তোলার মতো তেমন সময় ওর ছিল না। আমি দেখেছি, স্কুল থেকে ফিরে, দরজা আটকে, লেখার টেবিলে বই নিয়ে — কাগজ কলম নিয়ে ও বসত এবং দিনমান কবিতা-বিষয়ক ভাবনায় মগ্ন থাকত। তাই সেভাবে কবিতা ভাবনার বাইরে গিয়ে পুরস্কার-সম্মানের অপেক্ষা ও করেনি। ওর বাড়িতে দিনের পর দিন দেখেছি শূন্য ও শূন্য পরবর্তী কবিরা ভালোবেসে ওর কাছে এসেছে — ওর কবিতা নিয়ে পাগলামো করেছে — তরুণ কবিদের এই ভালোবাসাই ছিল ওর কাছে বড় পুরস্কার। প্রসঙ্গত একথাও জানিয়ে রাখা ভালো যে — বাংলা ভাষার প্রায় সকল উল্লেখযোগ্য পত্রিকায় ওর কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। যেমন– রক্তমাংস, দাহপত্র, মহারাজ, কৃত্তিবাস, কবি সম্মেলন, দেশ, সানন্দা, প্রতিক্ষণ, নন্দন, যুগান্তর, যুবমানস, সৃষ্টির একুশ শতক, অনুষ্টুপ, পরিচয়, প্রতীতি, তথ্যকেন্দ্র, আজকাল,

প্রতিদিন এবং বহু পত্রপত্রিকায় অজস্র কবিতা লিখেছে ও। কবিতা প্রকাশ হয়েছে বাংলাদেশ, ত্রিপুরা, আসাম, আন্দামান ও অন্যান্য স্থানের বহু পত্রপত্রিকায়। বহু সংকলনে স্থান পেয়েছে ওর কবিতা।

আমাদের অনেকেই যারা লেখালেখি করতে এলাম, তাদের অনেকের সবথেকে বড় সমস্যা লোভ — মানে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষা সব পেশার মানুষের মধ্যে বিদ্যমান। দাদা প্রবন্ধটির এক জায়গায় উল্লেখ করেছে — 'কবিতা লিখে কী হবে আমাদের? ঘোড়ার ডিম হবে। কবিতা না-লিখে কী হবে? ঘোড়ার ডিম। তাহলে দাঁড়াচ্ছে কী? একটা মেরুদণ্ড। আজ্ঞে হ্যাঁ, ওইটাই একটু মজবুত করতে চাইছি।' দাদা বলত, একজন কবি হওয়ার থেকেও একজন মানুষ হওয়া খুব জরুরি। অর্থাৎ মেরুদণ্ডটিকে সোজা রাখা এবং মজবুত রাখা। নয়ের অনেককেই দেখেছি অমেরুদণ্ডী কেঁচো হয়ে ঘুরে বেড়াতে। কী দাঁড়ালো তাদের কবিতার? ঘোড়ার ডিম। সুবীর মণ্ডল কবিতা লিখতে এসে ইজ্জত বেচেনি। বরং 'সত্যের হাত ধরে মিথ্যের উঠোনটুকু পার করতে চেয়েছিল সে। আর কিছু নয়।'

নিজেকে লুকিয়ে রাখি

তৈমুর খান

কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না
ভালোবাসা হারিয়ে গেল।
একটি হলুদ রঙের পোশাক ফেলে চলে গেল।
স্মৃতির উঠোন খাঁ খাঁ করে
পারস্পরিক শূন্যতায়
কিছু জ্বরের উষ্ণতা
ঘুরেফিরে খেলাধুলা করে।
দিনশেষের ক্লান্তি উড়ে আসে
সেও অদৃশ্য কোনও পাখি
আমার কাছেই বৈধতা চায়।
দু-একটি রাস্তা খুঁজে খুঁজে
নিরর্থ কল্লোলে আমি কান পেতে থাকি।
কে নৌকার দাঁড় টানে?
ছোপ ছোপ শব্দ হয়
শব্দের বিস্তারে রাত্রি নামে।
আমি স্তব্ধতার কাছে আমার ব্যাকুলতা রাখি
নিজেকে নিজের ভেতরে লুকাই . . .

জীবন রে, ও জীবন

জগবন্ধু হালদার

ছুড়ে দেওয়া কয়েনটা ঘুরতে ঘুরতে
মাটি ছুঁয়ে তোমাকে জিতিয়ে দিল।
শুধু এইটুকু অক্ষমতায় হেরে আমি আজও
পিঁপড়ের সাথে কানাকানি করে
খুঁজে নিয়েছি সূচিমুখ গর্ত, নিমফুল আর
ঘুটঘুটে অন্ধকার
ডানা ওঠা স্বপ্নের পথ গেছে বেঁকে হেমন্তের মাঠে
মুদ্রার অন্য পিঠ পেয়ে তুমি
দুপুর রঙে সাজালে পিদিম, সিঁড়িপথ আর
কলঘর খুলে আমূল সাতদিন স্নানে ভেজালে চোয়াল
করতলে নেই আর কোনও হিজিবিজি দাগ
এভাবেই খসে যাচ্ছে রং দেয়ালের

জীর্ণ জানলা থেকে দেখি জীবন চলেছে হেঁটে
জীবন্ত আল ধরে, ঢেউ হয়ে . . .

সহগামী

দীপেন্দু হালদার

যেদিন সবাই গর্ব করল তোমার জন্য
নৈকট্যের লড়াইয়ে আমি দূরে থাকলাম।
যদি সম্পর্কের নামকরণ সীমাবদ্ধতা দেয়!
পাছে তুমি কষ্ট পাও।

যেদিন সবাই তোমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ
উপস্থাপনার লড়াইয়ে আমি শিল্পী নই
যদি উপমা কাব্যিক না হয়!
পাছে তুমি কষ্ট পাও!

যেদিন সবাই তোমাতে মুগ্ধ হল
অভিনয়ের লড়াইয়ে চোখ সরিয়ে নিলাম
যদি আমার দৃষ্টি দিবাস্বপ্ন না দেখায়!
পাছে তুমি কষ্ট পাও।

যেদিন সবাই তোমার বিরুদ্ধে
প্রয়োজনান্তেও তুমি তাদের মতো নও
লড়াইয়ের ময়দানে তোমার পাশে দাঁড়ালাম
পাছে তুমি একা হয়ে যাও।

উদ্ভিদ জন্ম

দেবজিৎ দে

কবেই নিষেধাজ্ঞা হয়েছে জারি
চৌকাঠের এপারে
অভিমান রাখতে নেই
খেলা করি বিবর্ণ পাতায়
ছুঁই শিরা, উপশিরা, গোচরে
আসে রান্নাঘর।

কত রোদ-জল খুশিতে ঝলমল
হাওয়ায় সফল অভিযান
প্রাণ পায় ওপারে, এপারে
থাকে শুধু নুইয়ে!

ফোন
অমলেন্দুবিকাশ দাস

ফোনের ভিতর কথকতা। কথার ভিতর আলো।
আর আলেয়ার আভাতিবেলায় তার সাথে আলাপ।
ঋতু পরিবর্তনের মতো হাসি, কান্না, ক্রোধে, রিরংসায়
কখনো ভাস্বর কখনো ম্লান বিকালের রোদ্দুর হয়ে যায়।
যুক্তির পিঠে যুক্তি আবার যুক্তিহীন থাউকো ফুলের
পাপড়িতে আরাধ্যের অর্ঘ্য নিবেদন। পোড়ে প্রদীপের বুক।

বাতাসের আর্দ্রতায় বেজে যায় নিষ্করুণ সুর।
আলাপের পথে মাঝে মাঝে সাংকেতিক ম্যাসেজের
মতো তির ছুটে আসে। লক্ষ্যভ্রষ্ট পাখির পালক ঝরে
পড়ে — বর্গাদলিলে যেমন লেখা হয় নাম।

ফোন কখনও গান কখনও সংবাদ কখনও তদন্ত
আবার কখনও তিনি আদিম রহস্যঘন গোপন তরবারি।
ঝলকে ঝলকে সুতীব্র চিৎকারে — বেঁচে থাকতে চায়।

মনুষ্যত্বের প্রতি
রাবণ

একফালি চাঁদ কি খেতে পারে
ডুবে যাওয়া নৌকার স্বপ্ন?
যেমন করে বীভৎস কালো মেঘ
ঢেকে দেয় জ্যোৎস্নাকে!

বিষাক্ত হয়ে উঠেছে অর্থবিদ্যা।
অবৈধ সম্পর্কের হাতছানি
পোষ মানিয়ে নেয় ভালোবাসাকে!

শরীর নিয়ে ব্যাবসা
দেয় কি মনকে শান্তি?
যেমনটা রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন
দু-চোখ ভরে কৃষ্ণকলিকে দেখে!

শহরের ইতিকথা
মণিকা নস্কর

জঞ্জালে ভরা এ শহর আজ

মত্ত প্রেমের মাতাল নেশায়
গলি খোঁজে আরও তস্য গলি
বোবাকান্নারা দু-চোখ ভেজায়।

ধুলোমাখা এ শহরের মন
বস্তাবন্দি ফসিলে ভরা
তুমি আমি কোনও গলির ভিতরে
হয়তো হেঁটেছি হৃদয়ছাড়া।

হঠাৎ সেখানে সময়ের লাঠি
লাফ দিয়ে পড়ে প্রণয়ের কালে
মত্ত দু-বাহু শরীরের জোরে
বাঁধতে চাইছে কামনার জালে।

রাতপরিরা কাঁদে এ শহরে
শহরের আজ ফুসফুসে জরা
ঘুণধরা প্রেম ঠোঁটের কিনারে
ব্যর্থপ্রেমের আদরে ভরা।

তবু প্রেম এই শহরের বুকে
হয়তো বা বাঁচে গলির বাঁকে
কখনও লাল সিঁদুরের রঙে
এ শহর মধুবসন্ত আঁকে।

রাত্রি বিরতি
পুলক মণ্ডল

আজ বৃষ্টিভেজা উৎসব
এসেছে নক্ষত্রেরা, এসেছে গোলাপ
আছে রাতজাগা হাসনুহানাও
মুরলী না মঞ্জীর কোন সুর
আগে; ভাবতে ভাবতেই
উতল হাওয়ায় শুরু হয় উৎসব
রাত মিশে যায় বৃষ্টিভেজা হাসনুহানার গন্ধে
গোলাপেরা এগিয়ে যায় নক্ষত্রদের দিকে
আমার বাড়ানো দু-হাতে
ঝরে পড়ে অবিরত বৃষ্টি —
অনর্গল বৃষ্টির স্রোতের মধ্যে অপেক্ষা করি
অপেক্ষা করি তোমার কাছে
সর্বস্ব খোয়াতে!
উৎসবে কী বিরতি থাকে!
যদি থাকে তবে তা তোমার জন্য।

মন মেলে দি আবেশে
প্রিয়দর্শী

যন্ত্রণাগুলোকে পিঞ্জরে ধরে রাখা
যন্ত্রণাদায়ক।
যদি পারা যায় ভাসিয়ে দাও
ভাটার স্রোতে —
জোয়ার আসবে নিয়মে।

জীবনের মধ্যে জীবন প্রসব করে —
তাই তো জীবন বাঁচে।
যোগবিয়োগের অনুভূতিগুলো
কেবল স্মৃতি।

আজ যখন মিশে গেছি
অপরাহ্ণের নরম আলোয়
হয়তো বা শান্তনদীর মরা-স্রোতায়

চিলেকোঠার ঘরে এখন নিজেকে
একা মনে হয় না
অনায়াসে পেরোতে পারি
উজান স্রোতের নির্মমতা।

নিজেকে পোষমানানোর গল্পটা
ছুঁতে পারে মাটি থেকে আকাশ

হাত বাড়ালাম বন্ধু হবে এসো
মন মেলাতে আবেশে।

মেয়েটি
সরিফুল ইসলাম

অবাধ্য পৃথিবীর
নির্লজ্জ বেড়ে ওঠা
কিছুতেই হিসেব মেলাতে পারছে না
আপ্লুত চোখে চেয়ে থাকা মেয়েটি।

ভজন

বিশ্বজিৎ সাহু

অসীমবাবু ইতিহাসের শিক্ষক। খুব কড়া। বছর পাঁচেক আগে পর্যন্ত কী রামপেঁদানিটাই না দিতেন। বলতেন 'যে ইতিহাস জানে না তার ভূগোলে ঠাঁই নাই'। অর্থাৎ পৃথিবীতে তার সকল প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। তিনি শুধু যে ভালো মার দিতেন তাই নয়। ইতিহাসের মতো কবরে ঢাকা প্রাণহীন বিষয়কে এমন জাদু দিয়ে জীবন্ত করে দিতেন মনে হত যেন লাইভ দেখছি। কিন্তু এখন সে সবের কোনো বালাই নেই। সেবার কী একটা যেন ঘটনায় ছাত্র পিটিয়ে খুব ধাতানি খেয়েছিলেন অভিভাবকের কাছে। সহকর্মীরাও পাশে থাকলেন না। তারপর থেকে নিপাট ভদ্র দস্তুর হয়ে গেলেন বাঘা মানুষটি। তবে সেই আমলে যে নাম কামিয়েছিলেন তাতেই সন্ত্রস্ত এ প্রজন্ম।

ভজন সিঁড়ির প্রথম ধাপ থেকে দুর্বল। প্রতি বছর পেছনে গ্রেস মার্কের গুঁতো দিয়ে আজ তার নবম শ্রেণি। সরকারের পাশফেলহীন শিক্ষার দয়ার গণ্ডি পেরিয়ে এখন তার অবস্থা ভীত হরিণ -এর মতো। সারাক্ষণ এক চিন্তা পরীক্ষার পাঁচিল ডিঙানো যায় কী করে! সে প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করে ক্লাস করতে কিন্তু মন তার বোহেমিয়ান। পড়াশুনা করতে তার ভালো লাগে না। কদিন আগে গার্ডিয়ান কলে তার বাবা বিরক্ত হয়ে বলেছিল 'সারা সময় টো টো করে ঘুরে বেড়ায়। কারোর কথা শোনে না। কিছু বললে একটা খাতা পেন্সিল নিয়ে হিজিবিজি দাগ কাটতে থাকে। আর গোঁ মেরে বসে থাকে। রা টুকু কাড়ে না'।

ঠিক টো টো করে ঘুরে বেড়ানো নয়। ভজনের ছবি আঁকার বড় শখ। তাই মাঝে মধ্যে স্টিললাইফ বা ল্যান্ডস্কেপ বানাতে এদিক ওদিক উধাও হয়ে যায়। বাবা দিনমজুর। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের লোক। সবার পেটে ভাত জোগাতে প্রাণান্ত। তাই ছেলের ছবির শখটা কলমি শাকে জিরা দেওয়ার মতোই বিলাসিতার ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করা থাকে।

ভজনের বন্ধু রাজেশ ছবি আঁকে। নিজের আহ্লাদ পূরণ করতে সময়ে ছুটে যায় তার বাড়ি। সেখান থেকে তার ড্রইং স্যারের সঙ্গে আলাপ। ভজন হিন্দি গানের কলি গাইতে পারে দারুণ। কণ্ঠ সুর বেশ জমাট। স্যার যেখানে যেখানে টিউশনি করতে যায় ও চড়ে বসে বাইকে। সারা রাস্তা গান শুনিয়ে যায়। স্যারের ভালো লাগে কিনা জানা নেই তবে ওর মন্দ লাগে না। টিউশনে গিয়ে কত রকমের ছবি আঁকা দেখতে পায়। আঁকার নানা পদ্ধতিতে আকৃষ্ট হয়। রং ভরা শেখে। স্যার বললে মাঝে মধ্যে ওদের ছবিতে রং করেও দেয়। বাড়ি ফিরতে রাত হলে ভজনকে কটু কথা দিয়েই পেট ভরাতে হয়। কাকু চিৎকার করে বলে 'দুটো কেলাস পড়। যদি কিছু হয়। তা নালে পেটে কিল মেরে পড়ে থাকতে হবে।'

ভজন এসব কথা ভাবতে ভাবতে উদাস হয়ে পড়ে। তারপরেই দ্বিগুণ উৎসাহে ক্লাস করতে থাকে। ড্যাবড্যাব করে ক্লাসের স্যারের দিকে তাকিয়ে থাকে। কলমখানা একবার মুখ দিয়ে চিবায়, পরক্ষণেই খস খস করে কী যেন লিখতে থাকে। যেখানে আর ছাত্রদের চোখে ক্লান্তি আর অনীহার ছাপ স্পষ্ট, সেখানে ভজনকে দেখে অসীমবাবু তুষ্টি লাভ করেন। আর কারোর দিকে

নয়, ভজনের দিকে তাকিয়েই ইদানীং তিনি পড়াতে স্বস্তি বোধ করেন।

সেদিন হয়েছে বিপদ। ভজন আচমকা ফেঁসে গেল। ফার্স্টবয়ের অন্যমনা দেখে তাকে বকতে গিয়ে ইতিহাসের ওবিডিয়েন্ট স্টুডেন্ট ভজনের খাতা চেয়ে পাঠান তিনি। প্রথমে অনিচ্ছা দেখালেও পরে বাধ্য হয়ে খাতা স্যারের হাতে তুলে দেয়। অসীমবাবু তো অবাক। বিশ্বাসভঙ্গের রাগে তাঁর চিবুকসহ দাঁতকপাটি স্পষ্ট ওঠানামা করছে। এতগুলো পাতার মধ্যে কোনো জায়গায় ইতিহাসের কণামাত্র নেই। সাল তারিখ যুদ্ধ সন্ধি কমিশন কিচ্ছু নেই। পাতার পর পাতা শুধু ছবি। কলম দিয়ে আঁকা ছবি। তাও একজনের। অসীমবাবুর। প্রথমের দিকের ছবিগুলো কাঁচা হলেও পরের দিকে সাফল্যের ক্রম সাজানো। আজকের ছবিটি অবিকল তিনি। তাঁর চোখ জুড়ে জল ভরতি হয়ে আসে।

রাগ যেন কোথায় বাষ্পের বুদ্‌বুদ হয়ে উড়ে গিয়ে স্নেহের তুষারে পরিণত হয়েছে। অন্য কেউ কেন অসীমবাবু নিজেকে নিয়ে নিজেও কোনওদিন এত নিখুঁত করে ভাবেননি। তাছাড়া ভজনের মতো একটা কচি ছেলে তার ছবিতে এত ভালো হাত! শুধু পড়াশুনা দিয়েই যে বড়ো হওয়া যায় না তার সুললিত শিক্ষা পেলেন যেন ভজনের কাছ থেকে। কী যে বলবেন কিছুই খুঁজে পেলেন না। শুধু দুহাত দিয়ে বুকে টেনে নিলেন। পিঠ চাপড়াতে চাপড়াতে প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করলেন 'ভজন তুই একদিন বড়ো শিল্পী হবি।'

শেষ বিচার

অনীশ খ্যাপা

সালিশি সভা বসেছে হরিণপাড়া প্রাইমারি স্কুলে। বিচারক দীনেশবাবু উক্ত স্কুলের হেড মাস্টার। সালিশি সভা এবং রাজনীতি করে করে চুল পাকিয়ে ফেলেছেন তিনি। যখন যে পার্টি ক্ষমতায় তখন তিনি সেই পার্টির অবিসংবাদী গ্রামীণ নেতা। তাঁর নিত্য সহচর পচা, ধনু, মিলু, পালু, কনু নামের মারকুটে কয়েকজন চ্যালা গুরুকে অনুসরণ করে বর্তে যায়। এরা আবার সালিশি সভারও অপরিহার্য অঙ্গ।

পাড়ার জনছয়েক ছেলে পাঁচু মণ্ডলের পোড়ো বাঁশঝাড় থেকে খানকতক বাঁশ কেটে ভাস্করদের পুকুর পাড়ে আড্ডা দেওয়ার জন্য কুঁড়ে বাঁধছিল। সে খবর জানাজানি হওয়ার সুবাদেই রোববার সকালের এই সালিশি সভার আয়োজন। ছেলেদের অভয় দিয়ে এগিয়ে এল দলের পাণ্ডা মিন্টু। ছেলেরা বসে রইল স্কুললাগোয়া বটতলায়। তারা জানত জরিমানা তো হবেই, সঙ্গে জুটবে নাকে খত দেওয়ার মতো বিশ্রী সাজা। আর শেষপাতে লাথি-কিল-চড় তো থাকবেই। কিন্তু মিন্টু জানত অন্য কথা। সে সটান সভায় ঢুকে সপ্রতিভভাবে জানতে চায় —'আচ্ছা! এই সভার বিচারক কে?' খেঁকিয়ে ওঠে যমদুত চেহারার ধনু হালদার — 'কেন রে নবাববাচ্ছা! দীনেশবাবুকে চিনিস না বুঝি?' মিন্টু ঘাবড়ায় না। সে বেশ সরস ও উচ্চকণ্ঠে তারিয়ে তারিয়ে বলে — 'ও দীনেশবাবু বিচারক! তা উনি যে নিজের বউছেলে ছেড়ে ভদ্রাখুড়ির বাড়িতে রাতের পর রাত পড়ে থাকেন তার বিচার কে করবে?' সালিশি দেখতে আসা ছেলে-বুড়ো-মেয়ে-মদ্দ হাসিতে ফেটে পড়ে। যে কথা এতদিন কেউ উচ্চারণ করার সাহস পায়নি সেই কথার ধাক্কায় সভা নীরব হয়ে যায়। মিন্টু হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসছে দেখে ছেলেরা যথেষ্ট অবাক হয়।

ঠাঁই

সুব্রত হালদার

সংসারে অশীতিপর পুরোনো আসবাব ওরা, স্বামী-স্ত্রী। তরতাজা যুবক পুত্রের পোক্ত সংসারে অপোক্ত বড়োই বেমানান। অনন্যোপায়ে সহজলভ্য ঠাঁই বৃদ্ধাশ্রমের শৃঙ্খলে। ককিয়ে ওঠে স্বাধীনতা। সুদ-বর্মে আবৃত নাতির স্পর্শহীনতার যন্ত্রণা মৃত্যুকেও যেন অতিক্রম করে যায়।

আজ বুন্টুর জন্মদিন। ঘটনাচক্রে দাদুরও। জানে বুন্টু। কলেজ হোস্টেল থেকে ফোন এসেছে। তাড়াতাড়ি ফিরছে। বাবা-মা ব্যস্ত আনন্দায়োজনে। বাড়ির দোরগোড়ায় পাণ্ডুর মুখে হঠাৎ দেখে বুন্টুর সঙ্গে দাদুরা! 'আজ দাদুরও জন্মদিন মা। বৃদ্ধাশ্রম থেকে পাকাপাকি ছাড়িয়ে এনেছি। আমি চাই না এই বয়সে তোমাদেরও ওখানে ঠাঁই হয়।'

মাটি

অবকাশে সঞ্জয়

— বল তো মাটি লাল হয় কেন?

— যে মাটিতে . . .

— আঃ! পুঁথির ব্যাখ্যা শুনতে চাই না।

— তবে?

— দ্যাখ, মাটি তো মা-টি। তাই তাকে মাথায় ঠেকায়। সেই মা-টি লাল হয়ে যায় কেন?

— জানি না। জড়ের মধ্যেও জীবের খোঁজ! আমার ওসব আসে না। তুই-ই বল।

— আহা, বোরিং ফিল না করে একটু অন্যভাবে বোঝ। বেশ মাটির মূল কাজ কী?

— কী আবার! গাছের জন্ম দেওয়া।

— তাহলে এটা বলা যেতে পারে মাটি হল মাতৃগর্ভ।

— বাপ রে! মানলাম। তা সেদিক থেকেও মাটির লাল হওয়ার কারণটা খুঁজে পাচ্ছি না এখনও।

— ইউক্যালিপটাসের মতো কিছু গাছ আছে যারা মাটির উপর রীতিমতো অত্যাচার চালায়। আর সেই অত্যাচারের ফলেই রক্তাক্ত হয়ে মাটি লাল হয়ে গেছে রে!

— সন্তানের অত্যাচারে রক্তাক্ত মা! ভালো বলেছিস। কিন্তু প্রমাণ আছে কী?

— নিশ্চয়! ভালোমাটিতেও ওই গাছ বসিয়ে দেখা গেছে মাটিকে নষ্ট করে দিয়েছে। তবে মজাটা কোথায় জানিস? সবাই মাটিকেই দোষ দেয়। গাছেরও দোষ আছে, দোষ থাকতে পারে তা কেউ মানতেই চায় না। আমাদের সমাজে নষ্ট মেয়েগুলির অবস্থা ওই মাটির মতো।

এইটা আমার দেশ

প্রকাশ কর

আমাদের ঘটনাবিহীন এই প্রাত্যহিক জীবনের চারপাশে যে কত ছোটো ছোটো চলচ্চিত্র অবিরাম হয়ে চলেছে সেগুলো মাঝেমধ্যেই অলস দৃশ্যপটে ধরা পড়ে। যেখানে কোনও light-camera-action নেই, কিন্তু জীবনের গভীর সত্যগুলো আছে।

সেদিন দুপুর হবে, এপ্রিল-মে মাস, সূর্যদেবতা খুব রেগে থাকেন ওইসময়। আমি ট্রেনে বসে আছি। ট্রেন ছাড়তে মিনিট দশেক তখনও বাকি, প্ল্যাটফর্মে সারি সারি দোকান, আমার জানালার একদম সামনের একটা লেবু-সোডা জলের দোকানের ঠিক বামদিক ঘেঁসে দাড়িয়ে আছে একটা পরিবার। নিজের সন্তানকে কোলে নিয়ে একজন তিরিশ-ঊর্ধ্ব লোক, আর তার স্ত্রী। কোলের ছেলেটি খুব কাঁদছে আর ছটফট করছে। লোকটা সারাক্ষণই চেষ্টা করছে তাকে শান্ত করতে। লোকটির দারিদ্র্য ও ক্লান্তি তার পোশাক এবং চোখমুখে বেশ স্পষ্ট। কিছুক্ষণ পরে লোকটা কিছু টাকা হাতে নিল, টাকার দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ ইতস্তত করল, তারপর ওই লেবু-সোডা-জলের দোকান থেকে একগ্লাস লেবুজল কিনে প্রথমে সেটা এগিয়ে দিল নিজের স্ত্রীর দিকে, আর সাথেসাথেই কোলের বাচ্চাটা প্রচণ্ড নাছোড়বান্দা হয়ে উঠল সেটা খাবে বলে। অর্ধেকটা খেয়ে লোকটির হাতে গ্লাসটি দিল তার স্ত্রী। বামহাতে উদ্ধত ছেলেটিকে সামলে খানিকটা সে নিজে খেল, একদম তলানিটুকু দিল ছেলেটাকে। অবাক হয়ে দেখলাম ওইটুকু পেয়ে বাচ্চাটা একদম শান্ত ও স্থির হয়ে গেল। তারপর তারা সামনের দিকে এগিয়ে গেল।

এই যে ট্রেনের জানলার ফ্রেমে-দেখা ওদের একটুকরো জীবন, এই যে ওদের প্রাত্যহিক সংসারের একটুকরো ছবি, এগুলোই তো আমার দেশ। দেশের গভীরতম শিকড়ের উপশিরার উপেক্ষিত সত্য।

সিদ্ধান্ত

খাঁ সাহেব

ছেলের কলেজের বন্ধুরা এসেছে। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব তো আছেই। সুহাসিনীদেবী হাসি মুখে দক্ষ হাতে সবদিক সামলাচ্ছেন। আজ সত্তরতম জন্মদিনে প্রাণেশবাবুর হঠাৎই মনে পড়ে গেল জীবনের মোড়-ঘোরানো সিদ্ধান্তটির কথা।

স্কুল থেকে ফিরে খাতা দেখতে দেখতে উদাত্ত কণ্ঠে হাঁক দিয়েছিলেন — 'ছোট্ বউমা! এক কাপ চা দেবে।' চা তো আসেইনি; এসেছিল চাপাকণ্ঠের কদর্য হিসহিসানি —'বুড়োভাম কোথাকার! বিয়ে করার মুরোদ নেই, খালি হুকুমের পর হুকুম! মামদোবাজি পেয়েছে!' এর আগেও দুই ভ্রাতৃবধূর কাছ থেকে বিভিন্ন মন্তব্য শুনেছেন। কিন্তু আজকের এই অশালীন বার্তা প্রাণেশবাবুকে অস্থির করে তুলল। বাবা মারা যাওয়ার পর মা ও দুই ভাইয়ের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেওয়া পঞ্চাশ ছুঁইছুঁই কনফার্মড ব্যাচেলর, প্রাণেশবাবু ফোনটা তুলে ডায়াল করলেন — 'কে সুব্রত তো? প্রাণেশ বলছি, যা বলছি শোন চমকাবি না; কালকেই আমি বিয়ে করব। মেয়েদেখার দায়িত্ব তোর।'

Bob Dylan

Blowin' in the wind (1962)

How many roads must a man walk down
Before you call him a man?
How many seas must a white dove sail
Before she sleeps in the sand?
Yes, 'n' how many times must the cannon balls fly
Before they're forever banned?
The answer, my friend, is blowin' in the wind,
The answer is blowin' in the wind.

Yes, 'n' how many years can a mountain exist
Before it's washed to the sea?
Yes, 'n' how many years can some people exist
Before they're allowed to be free?
Yes, 'n' how many times can a man turn his head,
And pretend that he just doesn't see?
The answer, my friend, is blowin' in the wind,
The answer is blowin' in the wind.

Yes, 'n' how many times must a man look up
Before he can see the sky?
Yes, 'n' how many ears must one man have
Before he can hear people cry?
Yes, 'n' how many deaths will it take till he knows
That too many people have died?
The answer, my friend, is blowin' in the wind,
The answer is blowin' in the wind.

বব ডিলান
বাতাসে ভাসছে (১৯৬২)

তরজমা ঃ শিশির দাস

কত রাস্তা মানুষকে হেঁটে যেতে হয়
একটা মানুষকে মানুষ বলার আগে?
কত সমুদ্রে এক সাদা ঘুঘুকে ভেসে যেতে হয়
বালিতে ঘুমোবার আগে?
হ্যাঁ, 'এন', কতবার কামানের গোলাকে উড়ে যেতে হয়
চিরদিনের জন্য নিষিদ্ধ হবার আগে?
বন্ধু আমার, উত্তর ভাসছে বাতাসে,
উত্তর ভাসছে বাতাসে।

হ্যাঁ, 'এন', কত বছর এক পর্বত টিকে থাকতে পারে
সমুদ্রে ধুয়ে যাবার আগে?
হ্যাঁ, 'এন', কত বছর কিছু মানুষ বেঁচে থাকতে পারে
স্বাধীন হবার সম্মতি পাবার আগে?
হ্যাঁ, 'এন', কতবার একটা মানুষ তার মাথা ফেরাতে পারে
আর ভান করতে পারে যেন সে ঠিক দেখে না?
বন্ধু আমার উত্তর ভাসছে বাতাসে।

হ্যাঁ 'এন', কতবার একটা মানুষকে উপরে তাকাতেই হয়
আকাশ দেখবার আগে?
হ্যাঁ, 'এন', কত সংখ্যক শ্রবণ একটা মানুষের থাকতেই হয়
মানুষের ক্রন্দন শুনবার আগে?
হ্যাঁ, 'এন', অত বেশি মৃত্যু ঘটে যায় তার জানা পর্যন্ত
যে, বড়ো বেশি মানুষ মারা গিয়েছে?
বন্ধু আমার, উত্তর ভাসছে বাতাসে,
উত্তর ভাসছে বাতাসে।

ক্যারিবিয়ান কাব্যের দ্রোহীকন্যা গ্রেস নিকোলস

পাপড়ি মিত্র

আমি পাড়ি দিয়েছি একটি মহাসাগর
আমি হারিয়েছি আমার মাতৃভাষা
সেই মৃতভাষার শিকড় থেকে
জন্ম নিয়েছে একটি নতুন ভাষা
(Epilogue of *I is a Long-Memoried Woman* – Grace Nichols)

গ্রেস নিকোল্স-এর এই চারটি লাইন ক্যারিবিয়ান সাহিত্যের মূল সুরটিকে ধ্বনিত করে। ক্যারিবিয়ান মহিলা কবিদের মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় কবি গ্রেস নিকোল্স তাঁর মৌলিক প্রতিভার দ্বারা ক্যারিবিয়ান সাহিত্য তথা উত্তর ঔপনিবেশিক সাহিত্যের আঙিনায় এক স্বতন্ত্র ঘরানার সৃষ্টি করেছেন। ১৯৫০ সালে গুয়ানার জর্জটাউন-এ জন্মগ্রহণ করেন কবি নিকোল্স। তিনি গুয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কমিউনিকেশন বিষয়ে ডিপ্লোমা অর্জন করেন। শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি সাংবাদিকতার সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। ১৯৭৭ সালে অভিবাসী হিসাবে তিনি পাড়ি দেন ইউনাইটেড কিংডমে। তাঁর অধিকাংশ কবিতাতে ফুটে উঠেছে ক্যারিবিয়ান ছন্দ ও সংস্কৃতি। গুয়ানিয়ান ও রেড ইন্ডিয়ান লোকগাথাগুলি তাঁর কবিতাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে।

নিকোল্স-এর উল্লেখযোগ্য কাব্যগুলি হল —

I is a Long-Memoried Woman, London : Karnak House 1983.
· *The Fat Black Woman's Poems* , London: Virago Press, 1984
· *Over the River*, 1986
· *Hurricane Hits England*, 1987
· *Come into my Tropical Garden* (poems), 1988
· *Lazy Thoughts of a Lazy Woman* (poems), 1989
· *Sunris* , London: Virago, 1996
· *Startling the Flying Fish*, 2006
· *Picasso, I Want My Face Back*, Bloodaxe Books, 2009
· *I Have Crossed an Ocean: Selected Poems*, Bloodaxe, 2010
· Cosmic Disco 2013
· The Insomnia Poems 2017

নিকোল্স তাঁর প্রথম কাব্য '*I is a long-Memoried Woman*' এর জন্য ১৯৮৩ সালে *Commonwealth Poetry prize* লাভ করেন। এছাড়াও কাব্যচর্চার সুবাদে তিনি বিভিন্ন সময় নিম্নোক্ত পুরস্কারগুলি লাভ করেছেন —

x Arts Council Writers'Award (1986)

- Guyana Poetry Prize (1996)
- Cholmondeley Award (2000)
- Guyana Poetry Award *Never live unloved (* 2008)

আফ্রিকা দখলের পর শ্বেতাঙ্গ শাসকেরা সেখানকার কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদেরকে ক্রীতদাস বানিয়ে বলপূর্বক মাতৃভূমি থেকে উৎখাত করে নিয়ে আসে ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে। আফ্রিকা থেকে ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে আসার সময় এই অসহায় মানুষগুলোকে পাড়ি দিতে হয়েছিল আটলান্টিকমহাসাগরের সুদীর্ঘ পথ, যা ইতিহাসের পাতায় 'মধ্যবর্তী যাত্রাপথ' (*middle passage*) নামে সুপরিচিত। যে পাশবিক ও ভয়াবহ অত্যাচারের মধ্য দিয়ে তারা অজানা- অচেনা নতুন পৃথিবীতে এসে পৌঁছায় সেই করুণ কাহিনি বর্ণিত হয়েছে নিকোল্‌স-এর কবিতায়। একদিকে মাতৃভূমি ত্যাগের বেদনা, অন্যদিকে দাসত্বের নির্মম যন্ত্রণা আফ্রিকান ক্রীতদাসদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। দাসত্বের এই অভিশপ্ত জীবন সব থেকে বেশি দগ্ধ করেছিল আফ্রিকান নারী ও শিশুদের। গ্রেস নিকোল্‌স- এর কবিতায় এই দেশান্তর, সমুদ্রযাত্রা, নতুন পৃথিবী (ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ) ও ঔপনিবেশিক যুগের কুখ্যাত মধ্যবর্তী পথ (*middle passage*) বারংবার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। আফ্রিকার কালোমানুষদের দাসত্বের নির্মম যন্ত্রণাকে তিনি নিপুণভাবে কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। শোষিত, বঞ্চিত ও অত্যাচারিত কালো আফ্রিকান নারীরা শক্তি ও সহনশীলতার প্রতীকরূপে তাঁর কবিতায় আবির্ভূত। তিনি নারীদের দুর্বল ও অসহায়রূপে চিত্রিত করেননি; তাঁর নারীরা প্রাণশক্তির ধারক ও বাহক যারা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সকল অত্যাচার সহ্য করেও জীবনের যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে না। তাঁর কবিতা নারীদের দিয়েছে প্রতিবাদের নতুন ভাষা। তাই নারীবাদী সাহিত্যের ক্ষেত্র বিশেষত তৃতীয় বিশ্বের নারীবাদ ও কৃষ্ণাঙ্গ নারীবাদে তাঁর কবিতা অনবদ্য অবদান রেখেছে।

ইতিহাসের পাতা ও সাহিত্যের অন্দরমহল উভয় ক্ষেত্রে আফ্রিকান মহিলা ক্রীতদাসেরা কোনওদিনই তেমনভাবে সমাদৃত হয়নি। গ্রেস নিকোল্‌স এই প্রান্তিক মানুষগুলোকে কেন্দ্রবিন্দুতে এনেছেন। তাঁর অধিকাংশ কবিতাই আফ্রিকান মহিলা ক্রীতদাসদের দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা তাই এই কবিতাগুলি নিছক কাব্যিক আনন্দময়তায় মাতিয়ে না-রেখে ইতিহাসকে নতুনভাবে পর্যবেক্ষণ করতে অনুপ্রেরণা জোগায়। লেখ্য তথা স্বীকৃত ইতিহাসের বিরুদ্ধে গিয়ে তাঁর কবিতা এক বিকল্প ইতিহাস রচনার পক্ষপাতী, যে ইতিহাস শাসকের ক্ষমতা ও শাসনকে গৌরবান্বিত না-করে শাসিতের বেদনায় সমব্যথী হয়ে ওঠে। আসলে নিকোল্‌স-এর কবিতাগুলি মন দিয়ে নয় শরীর দিয়ে লেখা। ইংরেজি সমালোচনা সাহিত্যে এই বিশেষ শৈলীটি '*Writting from body*' নামে প্রসিদ্ধ। তিনি মনে করেন মন দিয়ে লেখা হল পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বৈশিষ্ট্য। তাঁর মতে শরীরের নিজস্ব ভাষা রয়েছে। আর সেই ভাষার মধ্য দিয়ে নারীহৃদয়ের যন্ত্রণাকে ফুটিয়ে তুলে তিনি চিরাচরিত ধ্যানধারণা বদলে দিয়ে পুরুষশাসিত সমাজের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। এখানে তাঁর এই অভিনব ভাষাশৈলীর একটু উদ্ধৃতি থাক — '*her belly cry sounding the wind*' *(one continent / To another)*। চিরাচরিত ধারা বর্জন করে এখানে তিনি 'হৃদয়ের ক্রন্দন' না-লিখে অনায়াসে 'জঠরের কান্না' শব্দবন্ধটির ব্যবহার করেছেন। তাঁর এই নারীবাদী মনোভাব ঈশ্বরসংক্রান্ত ধারণাকেও

বদলে দিতে চেয়েছে। পুরুষ ঈশ্বরের পৌরুষত্বকে অস্বীকার করে প্রকৃতির মধ্যেই তিনি নারীরূপী কালো-ঈশ্বরের বন্দনা করেছেন। *'Your Blessing'* কবিতায় তিনি লিখেছেন —

'Cover me with the leaves of your
blackness Mother ....
Cover me
Heal me Shield me

With the power of your blessings

Uplift me
Instruct me
Reclothe me

With the power of your blessings

Mother I need I crave your blessing
Mother I need I crave your blessing'

প্রকৃতির মধ্যে ঐশ্বরিক নারীসত্তার জাগরণ ঘটিয়ে নিকোল্‌স তাঁর আফ্রিকান পূর্বপুরুষদের আধ্যাত্মিক সংস্কারের পুনর্জাগরণ ঘটাতে সচেষ্ট হয়েছেন। তাঁর কবিতায় স্মৃতির একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। সমগ্র আফ্রিকান জনজাতির সুদীর্ঘ দাসত্বের নিরবচ্ছিন্ন ও মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতাকে কবিতায় মূর্ত করে তুলতে গিয়ে তিনি এক নিজস্ব ভাষাশৈলী নির্মাণ করেছেন। জাতির সমবেত স্মৃতিচারণা (Collective racial memory)-র মধ্য দিয়ে তাঁর কবিতা বারবার স্মরণ করে আফ্রিকায় পূর্বপুরুষদের ভিটেমাটি, আফ্রিকান জনজীবন, সংস্কৃতি, লোকাচার ও ধর্মীয় ধ্যানধারণাকে।

কবিতা রচনার ক্ষেত্রে নিকোল্‌স ইউরোপীয় কাব্যশৈলীকে অগ্রাহ্য করতে চেয়েছেন এবং খুঁজে নিতে চেয়েছেন আফ্রিকান কাব্যশিকড়কে। ইংরেজি ভাষায় কবিতা লিখলেও ইংরেজি কবিতার মাত্রা ও ছন্দ কোনোটাই তিনি অনুসরণ করেননি। তাঁর কবিতায় ছেদ, যতি ও বিরামচিহ্নের ব্যবহার বিরল। নিজের একান্ত অনুভূতি ও বিশ্বাসকে প্রকাশের প্রয়োজনে নিজেই নির্মাণ করে নিয়েছেন নতুন শব্দবন্ধ। প্রচলিত কাব্যধারাকে পরিহার করে নিজস্ব কাব্য-আঙ্গিক সৃষ্টির মাধ্যমে তিনি ইউরোপীয় কাব্যরীতির বিরুদ্ধে সুদৃঢ় প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন। সবমিলিয়ে নিকোল্‌স-এর কবিতায় যে কাব্যিক সৌন্দর্য, যে সাবলীলতা ও যে প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে তা তাঁকে একজন সফল উত্তর-ঔপনিবেশিক কবি হিসাবে বিশ্বকাব্যের দরবারে সম্মানিত করেছে।

প্রথম কাব্য 'I is a Long Memoied Woman'- এর সুবাদে নিকোল্‌স ক্যারিবিয়ান কাব্যজগতে নিজের পাকাপোক্ত জায়গা করে নেন। বক্তব্য ও আঙ্গিকের অভিনবত্ব, শিকড়সন্ধানী দৃষ্টিপাত, প্রতিবাদী নারীসত্তার জাগরণের নান্দীপাঠ ইত্যাদি তাঁর এই কাব্যটিকে স্মরণীয় করে তুলেছে। কাব্যগ্রন্থটি রচনার পিছনে একটি সুন্দর গল্প আছে। একদা নিকোল্‌স একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন যা এই কাব্যরচনার জন্য তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল। স্বপ্নে তিনি দেখেছিলেন কোমরে

ফুলের মালা জড়ানো এক আফ্রিকান তরুণী সাঁতার কেটে আফ্রিকা থেকে ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে আসছে। একটি সাক্ষাৎকারে নিকোল্‌স তাঁর স্বপ্নদর্শনের প্রসঙ্গটি এইভাবে তুলে ধরেছেন – '... when I woke up I interpreted the dream to mean that she was trying to cleanse the ocean of the pain and suffering that her ancestors had gone through in that crossing from Africa to the New World' (qtd.in Wisker 291.) স্বপ্নে দেখা এই মেয়েটিকে কেন্দ্রে রেখেই নিকোল্‌স তাঁর কাব্যটির পরিকল্পনা করেন। এই কাব্যের কবিতাগুলি মহিলা ক্রীতদাসদের আফ্রিকা থেকে ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে যাত্রার ভয়াবহ স্মৃতিকে উপজীব্য করে লেখা। ফলে মহিলা ক্রীতদাসদের উপর ঔপনিবেশিক হায়নাদের নির্মম দমনপীড়নের জীবন্ত দলিল হয়ে উঠেছে কবিতাগুলি। এই কাব্যের 'One Continent / To Another' কবিতাটির বাংলা তরজমা পাঠের মাধ্যমে আমরা নিকোল্‌স-এর কবিমানসের অনেকটাই বুঝে নিতে পারব। সেই সঙ্গে তৃতীয় বিশ্বের মহিলাদের তথা আমাদের ভারতবর্ষের লাঞ্ছিত-অবদমিত মহিলাদের মুখচ্ছবি মিলেমিশে একাকার হয়ে যেতে দেখব আফ্রিকান কৃষ্ণাঙ্গী ক্রীতদাসীর মুখচ্ছবির সঙ্গে।

এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে
('One Continent / To Another')

গর্ভের মধ্যবর্তী পথের শিশু
ধাক্কা দেয়
প্রতিহিংসাপরায়ণ ঈশ্বরের কন্যা
সে এসেছিল
একটি নতুন পৃথিবীতে
তার প্রসবের অবিরাম বেদনা
একটি মহাদেশ থেকে/ অন্য মহাদেশে

গোঙানি

বাতাসের মতো আওয়াজ করে তার জঠর কাঁদে

এবং পঞ্চাশ বছর পরে
সে ভুলে যায়নি
ভুলে যায়নি
কীভাবে সে সেখানে শায়িত ছিল
তার নিজের রক্তের মধ্যে

সেখানে শায়িত ছিল তার নিজের বিষ্ঠার মধ্যে

অন্ধকারের রক্তাক্ত স্মৃতিগুলি

কীভাবে সে বেলাভূমিতে হোঁচট খেয়ে পড়েছিল
কীভাবে ধাতব-শৃঙ্খল তাকে হিঁচড়ে ফেলে দিয়েছিল
কতটা তৃষ্ণার্ত ছিল সে . . .

কিন্তু একটি নারীরূপে জন্মগ্রহণ করায়
পুনরায় সে জেগে উঠেছিল
জেনেছিল এটা অন্ধকারের সূচনা
যদিও পারিপার্শ্বিকতা জানান দিয়েছিল এটা আসলে
যবনিকাপাত

এবং তার মতো আরও যারা তাদের সঙ্গেই সে সম্মুখে গিয়েছিল
সেই দাসত্ববন্ধনটা জেনেই কাস্তে দিয়ে খেত নিড়নোর জন্যে
সে কখনওই ঝরে যাবে না যেমন পুলটিস খসে যায়
শিশুদের কপাল থেকে

কিন্তু তাদের জন্যে দুঃখ পেয়েছিল সে
স্বাধীনভাবে হাঁটছিল
মুক্ত একটি ভূখণ্ডে
অন্ধকারে তার কৃষ্ণবর্ণ তনুটি
অস্পষ্ট অতীতের মধ্য দিয়ে
পুনর্জন্মগুলি
ভাসিয়ে তুলেছিল কঙ্গো
সিয়েরালিওন তাকে অনুসরণ করেছিল এবং
গোল্ডকোস্টও বটে যেখানে সে হাঁটত
দিগন্তগুলিকে খুঁজে বেড়াত হারিয়ে যাওয়া
চাঁদগুলির জন্যে
তার কোমরবন্ধনী রক্ষা করছিল ফাটলটিকে
নরম সিক্ত বনভূমি
তার উরুর মধ্যে

সৃষ্টির সুপ্রভাতের আগের দিনটির মতো
সে কল্পনা করেছিল এই নতুন পৃথিবী হবে
উর্বরতা থেকে বঞ্চিত

না, সে প্রস্তুত ছিল না
সেই সমুদ্রের জন্য যেটা তাকে কশাঘাত করেছিল
সেই আগুনের জন্য যেটা তাকে শুষ্ক ও বিশীর্ণ করেছিল
সেই কঠিন মাটির জন্য যেটা আঘাত করেছিল
তাকে
যেসব পাখিরা উড়ে গিয়েছিল
তারা দেখতে চায়নি সেই চরম
জীবনের স্বাভাবিকতা সকল স্থানে

এবং সেই পুরুষেরা যারা শিশুদের বীজ বপন করে
সে তৈরি ছিল না সেই চাহনির জন্য
তাদের চোখে

সেই হারিয়ে যাওয়া গভীর পুরুষত্ব
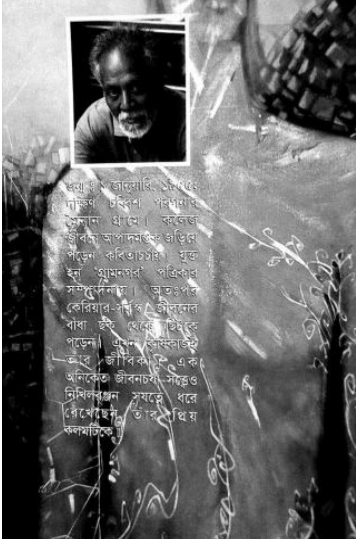
এখন সে ঝুঁকে থাকে
হরিৎ বেতখেতগুলির মধ্যে
জীবনকে খণ্ডিত করে সে বাঁচবেই

তথ্যঋণ ঃ

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Grace_Nichols.
2. “FROM THE ROOT OF THE OLD ONE” : RECONFIGURING INDIVIDUAL AND COLLECTIVE IDENTITIES IN ANGLOPHONE AFRO-CARIBBEAN POETRY —- WRITING BY OZLEM TURE .
3. CARIBBEAN WOMEN POETS — DISARMING TRADITION : WRITING BY CHRISTINE HARRIS.
4. The post - colonial studies reader EDITED BY Bill Ashcroft, Gareth Griffiths,Helen Tiffin.
5. The Empire Writes Back , Theory and practice in post - colonial literatures EDITED BY Bill Ashcroft, Gareth Griffiths,Helen Tiffin .
6. Twentieth - Century Caribbean Literature , Critical moments in anglophone literary history Edited by Alison Donnell .
7. THE WRETCHED OF THE EARTH , Frantz Fanon , Translated from the French by Richard Philcox with commentary by Jean -Paul Sartre and Homi K. Bhabha.

8. BLACK SKIN , WHITE MASKS,Frantz Fanon , Translated from the French by Richard Philcox.
9. THE LOCATION OF CULTURE, HOMI K. BHABHA.
10. Nation and Narration Edited by Homi K. Bhabha.
11. Ngugi Wa Thiong'o , Decolonising the Mind, The Politics of Language in African Literature.

প্রাচেতস কথা

অনুপম পাত্র

আমি তো ক্রমশ দুর্বোধ্য হবই। অচিরেই ঢেকে নেব নাব্য ছায়াতনু মায়াবী পত্রকে,
তা না হলে কেবলই তারল্য নিয়ে যৌথ সংকটে কেটে যাবে সাহচর্য বেলা।
তুমি বলো, অনন্য বিন্দু থেকে এই যে প্রকাশ্য হয়ে ওঠা আমি,
এই নক্ষত্রের ধুলো ছড়িয়ে রাখা পথ, এই যে খোঁজের অসুখে পড়ে
পথ ভুলে চলে আসা তুমি, এ সকল দৃশ্যের অন্তরালে নিহিত নির্যাসটুকুই
প্রকৃত সম্বল কিনা! তাই আমি বলব না আলোর দিব্যি খেয়ে,
তাই আমি আকাশকে বললেই জানি তুমি বিস্ফারিত তাকাবে
আর গগন-নন্দিত বিধৃত জিজ্ঞাসাকে আমি দুঃখের সংকেত করে
পাঠাবো লুপ্তপ্রায় হরিণের কাছে!

আসলে যে নাভিমূলে আশ্লেষ খুঁজেছ তুমি এতদিন,
সেখানে তো অমরার ঘ্রাণ চিহ্ন ছিল গভীর অতলে আঁকা,
যে বৃন্তে দংশনের নেশা তীব্র আঁকা আছে ভেবে গেছ তুমি,
সেখানে তো বর্ম শিরস্ত্রাণ লুকিয়ে রেখেছে নদী তার
ক্ষুধার্ত অববাহিকার প্রথম তৃষ্ণা মেটাবে বলে!
তুমি তবু ছলে বলে নিয়ম সঞ্জাত সব ছন্দ বসিয়ে দেবে কবিতার দেহে,
বহু ব্যবহৃত অনুপ্রাসের শিকলে বেঁধে দেবে রূপ জানাই তো ছিল!

জানাই তো ছিল, অপরাজিতার নীল অন্ধকারে হারিয়ে যেতে যেতে
ফিরে এসে একদিন হঠাৎ আবিষ্কার করবে সংকেত ভাঙার আনন্দ,
সে নির্বিকল্পতায় নিবিড় নিমগ্নতা দেব বলেই না সাজিয়ে রাখছি শিশির,
সাজিয়ে রাখছি কিউমুলোনিম্বাস, সাজিয়ে রাখছি
সম্ভাব্য সমস্ত সংকেত আগামী সুপারনোভায়!!

এখন সময়

হিমাদ্রি মুখোপাধ্যায়

পাহাড় জানে পক্ষাঘাতের ভাঙন কত নির্বিরোধী
নদী জানে ডুবন জলে বান ডাকে রোজ ভাঙনমুখী

পাতার হদিস গাছ রাখে না, নোঙর কেবল বালি চেনে
কবি কলম গিঁথিয়ে রাখে বৃষ্টিফোঁটার নাভিমূলে

ঠিক এভাবেই দিনের কাফন নামিয়ে রাখি আজ্ঞাবহ
নদীকথার জল জমে হয় বৃষ্টিকথার গিরিক্ষত. . .

নদী এখন প্লাবনমুখী — আষাঢ় কথায় ইলশেগুঁড়ি
বানভাসি হয় ভরসা ঢেউ, প্রেম-সাঁতারু উজান ধরে

এদিকে নদীর বিশবাঁও জল — রোজ ডুবছে ঘরের ছেলে
কবি লেখেন — 'পদ্যফোঁটা -আজ এলি তুই আমার ঘরে!'

এভাবেই তো সময় যাচ্ছে, কবি — এ দেশ বিপথগামী
জাতের নামে, ভেদের নামে এখন সময় ধর্ষকামী।

সব হার লজ্জা নয়

বি. কে. স্বপন

আমি হেরেছি তার মানে এই নয়
তুমি জিতে গেছ,
শকুনিও জিতেছিল সাপলুডোর মই বেয়ে
নিরানব্বইয়ের ঘরে বিশাল এক সাপ
ঠিক চিনে রেখেছিল তাকে, তারপর যা হবার ঠিক তাইই হয়েছিল

মারাদোনা বিশ্বকাপ জিতেছিল, মিথ্যে নয়
তার সেই গোল ফিসফাস হয়ে ছড়িয়ে পড়ল গোটা বিশ্বে
বাতাসে কান পাতলে আজও শোনা যায় তার প্রতিধ্বনি

আমি হেরেছি তার মানে এই নয়
আমি জিততে পারতাম না
হারজিত দিয়ে যোগ্যতার বিচার হয় না
হয় শুধু আফশোসের শরীরে সান্ত্বনার পোশাক পরানো
আর নতুন এক যুদ্ধের পুনঃপ্রস্তুতি

আমি হেরেছি তার মানে এই নয়
যুদ্ধজয়ের আশা ছেড়ে তপোবনবাসী হব
আর তুমি দুর্যোধন হয়ে ..

সব জয় যেমন গর্বের নয়, ঠিক তেমনি সব হারও লজ্জার নয় . . .

পাগলি তোকেই খুঁজেছি

আজিজুল হক বাবলু

এক

ভালোবাসা বুঝিনি কেউ
যতটা অনুভূত হয় হৃদয়ে . . .

দুই

দু-চোখ ভরা জলে
এ হৃদয় নিঃস্ব হতে জানে
সে জল যদি তোর ঠোঁটে হাসি আনে।

তিন

তুই সুন্দর হবি বলে
আজও চেয়ে আছি নেকড়ের চোখে . . .

চার

এত আলো, তুই কিন্তু আলেয়া।

ফকিরের ধর্ম

শান্তনব চৌধুরী

ঈশ্বরের খোঁজে পুত্তলিকা জ্বলে
জীবিত ও মৃতের ভাষাহীন আলাপন

মৃদু আলোয় স্বপ্ন-মায়া খেলে
নীরব অশ্রু সরবে বয়।

ফকির জানে না তার সংসার ধর্ম
ইন্দ্রিয়ের সাথে চলে সক্রিয় যুদ্ধ।

নিশ্বাস ও দীর্ঘ প্রশ্বাস ও দীর্ঘ
বিচিত্র আকৃতিগুলি ও প্রাণময় হয়ে ওঠে।

কুঁড়েঘর

অরুণ পাঠক

গাইতে যাওয়ার আগে স্বর সংশোধন করি
নিত্য ধূলি-আবরণ বাইরে বসিয়ে রেখেছে
ভেতরে বাতাস তার অনন্যে অস্থির, আর
পরিচর্যা করে যাচ্ছে শব্দের বাগান মনে মনে

উঁচু এক বিদ্যুৎ-মিনার, চাবুক উঁচানো ভয়
যমের দু-চোখ থেকে দূরে নির্দ্বিধায় সেই
অবলীলা হার মানে প্রগতির কাছে আর
অন্ধের কানাই প্রকাশিত হয় বুক ঠেলে

এইবার সংসারে ফেরো, দেবতার রাজকাজ
আমাদেরই কণ্ঠে-কায়ায় কুঁড়েঘর গড়ে

এই আমি

চন্দন দাস

তেমন করে কেউ বলেনি — ভালোবাসি
তবুও
তুমি এলে সোনালি ধানখেত ছুঁয়ে
নবান্ন উৎসবের মরশুমে।
আজ দেখলাম
তোমার দরজা-জানালা হাট করে খোলা
তোমার শরীরে যেন পূর্ণিমা চাঁদ ঝলকায়

সঙ্গত ঃ মধুলোভী পিঁপড়েদের আনাগোনা।

তুমি আতৃণ — আকাশ জুড়ে
উড়ে বেড়াচ্ছ ফুলপরি হয়ে।
আমার দু-চোখের অনায়াস বৃষ্টিতে
এখন ভিজে যাচ্ছে কালরাত্তি।
জলছবি খেলছে হৃদয়ের ক্যানভাসে।

অনাহূত যন্ত্রণায় দ্বিখণ্ডিতএই আমি,
দু-চোখের ব্যাকুল ছায়ায় দেখছি
তোমার মুক্ত সহবাস।

নৃত্য
শিশির দাস

দিনরাত নৃত্য করে পথে পথে আলো-অন্ধকারে
হাতে নিয়ে একটি রুমাল
পরনের জামা-প্যান্ট ফর্সা কাচা ইস্ত্রিও করা
মুখে আছে অল্প দাড়ি-গোঁফ
মাথার চুলও নয় খুব বড়বড়
সুন্দর দেখতে সে, দোহারা দীর্ঘ তার শরীর গঠন
পায়ে আছে জুতো আর হাতে আছে, রুমাল একখানি।
খুব ভালো ছাত্র ছিল সে
স্কুলে-কলেজে ফার্স্টবয় বরাবর সে
মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাসও করেছে।
আজ ওর বাবা নেই, বিধবা-জননী;
একমাত্র দিদি ওর স্বামী ছেড়ে দিয়ে
বাপের বাড়িতে থাকে, একটিমাত্র ছেলে।
সেই দিদি চাকরি করে সংসার চালায়।
আর এই ডাক্তারভাই নৃত্য করে পথে পথে রুমালটি হাতে নিয়ে তার।
পাশের বাড়ির মঞ্জুলতার সঙ্গে বাল্যপ্রেম ছিল ছেলেটির
ডাক্তার হয়েছে সে, তবু মঞ্জু বিয়ে করে অন্য জায়গায়
মঞ্জুর বিরহ-দুঃখে এত নৃত্য আত্মবিদ্রুপ?
নাকি সেই মঞ্জুকেই কষ্ট দিতে নৃত্যলীলা তার?
তাকে সঙ্গিনী পাওয়া এতই জরুরি ছিল যে,
পথে পথে নৃত্য তার, নিজেকে উন্মাদ বলে প্রতিপন্ন করা?

সময়, আমি ও আমরা
শুধুই স্বরাজ

ভালো সময়েতে: গাছে থোকা থোকা ফুল
— তারই মধ্যে দু-একটি ফল হবে।
সময়ই বলবে কোনটা ঠিক বা ভুল,
কোনটা যে জিত কোনটা যে পরাভবে।

যত দুধ দেখি ততখানি নয় ক্ষীর,
সময় নিয়েই আমি দেই শুধু জ্বাল।
দ্রুততায় নয় অপেক্ষা ভালো: ধীর
কতখানি তিল কতখানি আছে তাল।

তোমার আমার মধ্যে সময় রাখো
দরকার আছে এমন সময় যাপন।
তাড়াহুড়োতে সবকিছু হয়নাকো
স্পষ্ট হোক পর না তুমি আপন।।

অনুভূতিমালা
চন্দ্রনাথ মণ্ডল (বিট্টু)

নিঃশব্দ! তবু চুপ থাকতে চায় না।
কাল্পনিক! তবু অস্তিত্ব হারায় না!
আবেগগুলো শব্দ খোঁজে
নিজস্ব তাগিদে।

তবে বুদ্ধি খুব চাপে পড়ে
যখন চেষ্টা করে হিসাব মেলাতে
ভুল আন্তরিক হওয়ার প্রস্তুতিপর্ব ছিল?
নাকি সবই অভ্যাস।

ভুলের অজুহাত থাকে নিশ্চয়ই
তাই প্রতিশ্রুতিও অলীক হয়
একসময়।
তবুও যে চাই কোনও আবেগ
শুধু আমারই হোক।

হয়তো বা শুধু অভিজ্ঞতা হয়েই থাকবে
কিংবা কোনো মেঘলা বারান্দা হবে
তোমার মুক্ত বিচরণভূমি
যেখানে তুমি সুখ নাও পেতে পার।

চাঁদ দেখতে চাও?
তবে তো অন্ধকার চাইতেই হবে
আর সুমন্ত্র চাইলে
যে-কোনও সহৃদয় ব্যক্তিই
সাহায্য করবে।

সংসারি শব্দযান

সৈকত

তাকে তাকে ভরিয়ে দিচ্ছ নিষিদ্ধ দিনায়ু
ডোবানো চাঁদের টিকিতে কার্পাস বস্ত্রমোড়া আলো
সেও এষণার সবটুকু বোধ।
কখনো পালসাখাতায় আর চালা ঘরে
অন্ধ বৈরাগী দ্যাখে, বসন্তে-ফুলে নতুন রং।
অব্যবহারে কালিহীন হয়ে ওঠে বাসন, বস্ত্র
আরেকটি ফুল,
আরেকটি শিশু,
নিজেকে তুলে ধরে পদ্মপাতা ঠেলে ঠেলে।
ওর নামে মিছিল নামবে কনভয় চিৎকার করে উঠবে
শীৎকার করে উঠবে মন্ত্র-পুঁজি।
কনভয় জুড়ে নাবালক গান গাইবে
পারাপার করবে দূর থেকে দূরে।
অথচ সাবলীল সন্ধ্যায়, বসন্ত বুকে নিয়ে পাখি ডাকে
আমাদের ফিরিয়ে দেয় ভাগাড় থেকে দূরে
মরাজন্তু কিংবা কাক, যেটাকে বলতে তুমি
তার চেয়েও বেশি বেশি এই আমি, আমাদের সাবালক ঘুম।
ঘুম চিরে খুঁজে নিয়ে দিনায়ু বেহেস্তের প্রণামী আলাপ।
ওর দু-চোখে রসনা পিঞ্জর বোঝাই নোঙরধ্বনি।
নাবিক গান গায় ফুলের গন্ধের আর শ্রমের
বিহ্বল চাঁদ, নিশ্চিন্তে জলে ডোবে।
নিজেকে ডোবাও তুমি, ওগো দৈন্যপথ
হারিয়ে গেছ হরিণশিশুর মতো
ওগো জোতজমি ছাড়া
তুমি তো পালাতে পারবে না।
দেখি বিদায় বসন্তে নবীনের গান, আগুন জ্বলার আগে
স্মরণে স্বপ্নের পথ, আঁকা নতুবা গড়া
হাত থেকে দূরে সরে গিয়ে এত অপরিচিত হই রোজ
আম্রপাতায় দেখি খোদাই ছায়া, স্রোত অভিমুখে
স্থলযান থেকে ছিটকে পড়ায়

আবাল্য ভূমিতে শুধু নির্ঘণ্ট দংশন।
খবর আসে দেশে, বদলি হচ্ছে মেঘ।
আমরাও জলহীন মেঘ দেখব এবার।
কতদিন ওই থালা ভরা এজলাসে
বিচারপতির ঘর্মাক্ত ভ্রূবেয়ে নেমে আসে না
আসামি-ভয়ের সমন তুরুপ।

যা পাখি

সুমন চক্রবর্তী

যা পাখি যা না উড়ে
আমায় ছেড়ে অনেক দূরে
তোকে আর ডাকব না রে
মন থেকে তুই যা হারিয়ে
খাঁচার ভিতর উলটো বাটি
পুরনো সব দিনের স্মৃতি
যৌথজীবন যাপনরীতি
থাক পড়ে থাক

তোর মন হয়েছে আনমনা
ভাবছিস আর থাকবি কিনা
উড়ে যাবি আমায় ফেলে
মিশবি গিয়ে জংলি দলে
একটু শুধু খেয়াল রাখিস
না যেন কোনও খাদে পড়িস
কোনও শিকারির শিকার হয়ে
জখম হলে তিরের ঘায়ে
আমায় ঠিক পড়বে মনে
সে দিনের সেই ধূসর দিনে
হয়তো চাইবি আসতে ফিরে
পায়ের লোহার শিকল ছিঁড়ে
পারবি না তুই পারবি না।

ওড়ার আগে চিন্তা কর
ছাড়বি কি এই সুখের ঘর?
চাইলে যেতে যা না উড়ে
আসতে হবে আবার ফিরে
হয়তো সেদিন পাবি না ফাঁকা
ফেলে যাওয়া এই ছোট্ট খাঁচা
দেখবি আমার মনের দাঁড়ে
অন্য পাখি বসত করে . . .

অচেনা স্বপ্ন
সুমিত মোদক

পৃথিবীকে চিনে নিতে পারি সময় এলে;

সূর্যের সাতটা রং মেখে নিতে পারি
যখন তখন;

সমাজ-সভ্যতার উপর শিকড়ের মতো
আঙুল ছড়িয়ে দিয়েছি;

কিছু অচেনা স্বপ্ন বেরিয়ে আসতে থাকে
মস্তিষ্কের মধ্যে দিয়ে;

সবুজ পাতাগুলো ঝরে পড়তে পড়তে
শুকনো ডালগুলো বেরিয়ে আসে;

পৃথিবীকে নতুন রূপ দেব এ'বেলা।।

অন্ধকারে হাঁটা
মৈনাক সরকার

অন্ধকারে হেঁটে চলা ভ্রাম্য এক ছায়া,
অতীতকালের ধন্ধে পড়ে ছুটতে চাওয়া কায়া
কীসের টানে আটকা পড়ে হচ্ছে পুড়ে ছাই
আঁধার আলোয় নিকষ রাতে নিশুতি রোশনাই।

কালো হাতেও সহানুভূতি হাতের রেখা কাটা
কাটা রেখায় ভালোবাসা রক্তভেজা হাতে,
ছায়া বলে বাসতে বারণ ভালোবাসার খেলা।
ছায়া হয়েও বাঁচতে গেলে পয়সা লাগে রোজ,
পয়সা পেতে ছায়া নিল যান্ত্রিকতার খোঁজ।

ভালোবাসায় আঁতকা তোলে কালো হাতের ছায়া,
ভালোবাসার অন্তরালে কাতরানো এ প্রাণ,
বন্ধ-ছায়ার মুক্তি চাওয়া নিভৃতে কাঁদে রোজ।
পেটের দায়ে আটকে পড়া কালো হাতের ছায়া,
নেতিয়ে পড়ে নগ্ন রাতেই অন্ধকারে হাঁটে
আলোর টানে হাঁটতে গিয়ে হোঁচট খেয়েও ওঠে।

দূরে কোথাও প্রদীপ জ্বলে নীচটা থাকে কালো,
কালো হাতেও জ্বালতে সে চায় প্রোজ্জ্বলিত আলো,
বাতাস এল নিভল প্রদীপ হচ্ছি পুড়ে ছাই,
কালো হাতকে ভালোবাসি বলতে দ্বিধা নাই . . .

জেন : রিপুতাড়িত মানবের নিকট সুসমাচার

চন্দন মিত্র

ধ্যান > ঝান >চ্যান > জেন

'ভণই লুই আমহে ঝাণে দিঠা।
ধমণ চমণ বেণি পাণ্ডি বইঠা।'

বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন চর্যা-সংকলনের সূচনা-পদে সিদ্ধাচার্য লুইপাদ এমন কথা বলেছেন। এখানে 'ঝাণে' শব্দটির অর্থ ধ্যানে। সংস্কৃত 'ধ্যান' শব্দটি বিবর্তনের পথে পালি ভাষায় হয়েছে 'ঝাণ'। প্রাচীন বাংলায়ও ধ্যান শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে ঝাণ শব্দটির প্রচলন লক্ষ করা যায়। শব্দের এই ধ্বনিগত বিবর্তন বেশ মজাদার। অনেক সময় পরিচিত শব্দ এমনভাবে বিবর্তিত হয় যে, চেনার উপায় থাকে না। আমাদের আলোচ্য 'জেন' (Zen) একটি জাপানি শব্দ। শব্দটি শুনে আমাদের কখনওই মনে হয় না এমন বিজাতীয় শব্দের সঙ্গে আমাদের নাড়ির যোগ আছে। কিন্তু আশ্চর্য হলেও সত্যি এই জাপানি শব্দটির সঙ্গে আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতির সম্পর্ক নিবিড়। 'জেন' শব্দটির শিকড় আমাদের দেশের মাটিতেই প্রোথিত। সংস্কৃত 'ধ্যান' শব্দটির পালি-রূপ 'ঝাণ' যখন প্রতিবেশী দেশ চিনে পৌঁছাল তখন সে দেশের মানুষের উচ্চারণে তা হয়ে গেল – 'চ্যান' (Chan)। আবার জাপানিদের সংস্পর্শে এসে এই 'চ্যান' শব্দটিই 'জেন' (Zen) রূপে ধ্বনিত হল।

বোধিধর্ম : অনুসন্ধিৎসু এক মহাযানী শ্রমণ

'ঝাণ' শব্দটি দেহে মনে বহন করে বোধিধর্ম চললেন চিনদেশে। মহাযান পথের সাধককে এভাবেই জগদ্ধিতায় প্রব্রজ্যা বেছে নিতে হয়। হীনযানীদের মতো কেবল আত্মসিদ্ধি অর্জনের আয়োজন নয়; মহাযানীদের জগতের সকল মানুষের সিদ্ধির কথা ভাবতে হয়। চৈনিক নথি থেকে বোধিধর্মের পূর্বাশ্রম সম্পর্কে কিছু কথা জানা যায়। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকের শেষার্ধে দক্ষিণ ভারতের এক রাজপরিবারে তাঁর জন্ম। প্রখ্যাত জাপানি গবেষক Tsutomu Kambe মনে করেন তামিলনাড়ুর কাঞ্চিপুরমই বোধিধর্মের জন্মস্থান। বোধিধর্মের সময়ে কাঞ্চিপুরম ছিল পল্লবদের রাজধানী। যাইহোক দুই অগ্রজের উপর রাজ্যের অধিকার সঁপে দিয়ে সন্ন্যাস নিয়ে বোধিধর্ম বেরিয়ে পড়েন প্রব্রজ্যায়। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের প্রথম দশকে তিনি দক্ষিণ চিনের গুয়াং ঝউ-তে পৌঁছান। তখন সেখানে লিয়াং বংশের (৫০২ - ৫৫৭ খ্রিস্টাব্দ) রাজত্ব চলছে। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী রাজা উ (Wu) বোধধর্মকে আমন্ত্রণ জানালেন রাজধানী জিয়াং কাং-এ। বোধিধর্ম আমন্ত্রণ রক্ষা করলেন। বুদ্ধের দেশের এক সন্ন্যাসীকে দেখে রাজা উ আপ্লুত হয়ে জানতে চাইলেন —

'মান্যবর! পশ্চিম দেশ (ভারত চিনের পশ্চিম দিকে অবস্থিত) থেকে আপনি আমাদের

জন্য কোন সূত্র বহন করে এনেছেন?' — 'শিক্ষণীয় একটি শব্দও আমি বহন করে আনিনি।' বোধিধর্ম উত্তর দিলেন।

সম্রাট উ বললেন —'আমি অনেক মঠ নির্মাণ করেছি। অজস্র সূত্রের তরজমা করিয়েছি, অনেক শ্রমণকে সহায়তা দিয়েছি। এসব কাজের জন্য আমার কতটা পুণ্য অর্জিত হয়েছে?' বোধিধর্ম বললেন — 'এসব মনগড়া জাগতিক ধারণা। বস্তুর ছায়া যেমন সত্য নয়, এই পুণ্য-সংক্রান্ত ধারণাও সত্য নয়।' উ এবার প্রসঙ্গ ঘোরালেন — 'মহান-সত্য প্রকাশক প্রথম সূত্রটি কী?'
বোধিধর্ম – 'মহান সত্য বলে কিছু নেই।'
উ – 'কে আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন?'
বোধিধর্ম – 'আমি জানি না।'
রাজা উ আগন্তুকের মুখে এমন অদ্ভুত কথাবার্তা শুনে ভাবলেন, লোকটির মাথা একেবারেই গেছে! আসলে এমনই হয়। এমনই হওয়ার কথা। আমাদের সংস্কার, আমাদের চেনা-চৌহদ্দির মধ্যে পাওয়া অভিজ্ঞতা, আমাদের জন্মসূত্রে পাওয়া ধর্ম, শেখা শাস্ত্র ইত্যাদির বাইরেও যে সত্য থাকতে পারে এমনটা আমরা ভাবতেই পারি না। ভাবতে গেলে বিপন্ন বোধ করি; খেই হারিয়ে ফেলি। রাজা উ-র ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। হলেও তিনি রাজা। তাঁর রক্তের ভিতরেও তো আমাদের মতো বিপন্নতার বোধ খেলা করে।

শাওলিন মঠ এবং কুং ফু-ওস্তাদ সন্ন্যাসী

বোধিধর্ম এগিয়ে চললেন। পৌঁছে গেলেন হেনান প্রদেশের ইয়ং নিং মঠে। কিন্তু মন বসল না। আসলে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল 'শাওলিন মঠ'। মস্তকের অগ্রভাগ কেশশূন্য, মুখে দাড়ির জঙ্গল, পালোয়ানের মতো যুতসই চেহারা এমন বিদঘুটে দর্শন বিদেশি সন্ন্যাসীকে শাওলিন মঠে স্বাগত জানানো দূরের কথা তাঁর ধার্মিকতা নিয়ে ধন্ধ দেখা দিল। কিন্তু বোধিধর্মের মন কেড়ে নিয়েছে পর্বতচূড়ার এই আরণ্যক মঠ। তিনি কাছেই একটি গুহায় দেয়ালের দিকে মুখ করে ধ্যানে বসলেন। এমন আহাম্মক সন্ন্যাসীকে দেখে শাওলিন মঠের লোকজন অবাক হয়ে গেলেন। আসলে আহাম্মক বোধিধর্ম নন, মঠের লোকজন। কারণ চক্ষু মুদে যখন ধ্যানে বসব তখন সামনে ফাঁকা মাঠ থাক বা দেয়াল থাক তাতে কীই বা আসে যায়! বোধিধর্ম এখানে নয় বছর ধ্যানে কাটান। এক নাছোড়বান্দা ভক্ত এসে জোটেন হুইকে (Huike)। বোধিধর্মকে ছায়ার মতো ছুঁয়ে থাকেন। শুরু হয় ভয়ংকর শৈত্যপ্রবাহ। রাতের প্রাণান্তকর তুষারপাত অবজ্ঞা করে দাঁড়িয়ে থাকেন তিনি। কোমর সমান বরফ জমে যায়। বোধিধর্ম জিজ্ঞেস করেন — 'কী চান?'
—'আমাকে আপনি সার্বজনীন সত্য ও করুণার জগতে প্রবেশের দুয়ারটি খুলে দিন প্রভু!'
— 'আপনি সামান্য জ্ঞান, অগভীর ও অহংকারী মন নিয়ে যে চেষ্টা করে যাচ্ছেন, তা ব্যর্থ হতে বাধ্য। আপনি ফিরে যান।'

হুইকে ফেরার জন্য আসেননি। দিনের পর দিন কেন পড়ে থেকেছেন, ফিরে যাওয়ার জন্য! বামহাতটি কেটে গুরুকে দক্ষিণা দিলেন। বোধিধর্ম এই সমর্পণ এড়াতে পারলেন না। 'ঋণ'

বা ‘চ্যান’ এর জগতে হুইকে প্রবেশাধিকার লাভ করলেন। অন্য এক নথি বলছে হুইকে হাত কাটেননি; ডাকাতদের সঙ্গে লড়াইয়ে আগেই তিনি বামহাতখানা খুইয়েছিলেন।

শেষমেশ বোধিধর্ম শাওলিন মঠে সাদরে গৃহীত হলেন। শাওলিন মঠের বৌদ্ধসন্ন্যাসীদের চেহারা দেখে বোধিধর্ম আঁতকে উঠলেন। নিছক ধ্যান করে করে তাঁরা সব একএকটা জড়ভরত হয়ে উঠেছেন। এমন রুগ্ণ হতচ্ছাড়া চেহারা নিয়ে সাধনভজন কী, সামান্য কোনো কাজ করাই সম্ভব নয়। তিনি সন্ন্যাসীদের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে শারীরিক কসরত চালু করলেন। চৈনিক কুস্তির সঙ্গে তিনি মিশিয়ে দিলেন দক্ষিণ ভারতীয় যুদ্ধকৌশল এবং নিজস্ব পর্যবেক্ষণলব্ধ বিভিন্ন পশুপাখির আক্রমণ-প্রণালী। তৈরি হল আত্মরক্ষামূলক এক অসাধারণ সামরিক শিল্প – কুং ফু। সঙ্গে দিলেন শ্বাসপ্রশ্বাস-সংক্রান্ত নিয়ম ও পরিমিত ধ্যান। সমকালীন চিনে প্রচলিত লাও ৎ সে (Lao Tse) -এর তাও (Tao) দর্শন দ্বারাও বোধিধর্ম প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাওবাদীদের মতো তিনিও সাধনপথে প্রকৃতির সঙ্গে মিশে থাকা ও জীবনের ওঠাপড়াকে সহজভাবে গ্রহণ করার উপর জোর দিয়েছিলেন। এছাড়া বোধিধর্মের মননে নাগার্জুনের মাধ্যমিক মত বা শূন্যবাদ তো প্রোথিত ছিলই।

‘বাক্‌পথাতীত কাহিব কীস’

বোধিধর্ম চিনদেশ ত্যাগ করে ভারতে প্রত্যাবর্তনের আগে (কোনো কোনো নথি অনুযায়ী মৃত্যুর অব্যবহিত আগে) প্রিয় শিষ্যদের একত্রিত করে বললেন তোমরা প্রত্যেকে অর্জিত প্রজ্ঞা বিষয়ে দু-একটা কথা বলো। প্রথমে মুখ খুললেন দাও ফু — ‘এই বিষয়টা শব্দ বা বাক্যাংশ দিয়ে বোঝানো যাবে না। আবার শব্দ বা বাক্যাংশ বহির্ভূত বিষয়ও নয় এটা।’

বোধিধর্ম বললেন — ‘তুমি আমার চর্মের অধিকারী হলে।’

এবার এগিয়ে এলেন নান জং চি — ‘এটা অক্ষোভ বুদ্ধের জ্যোতির্ময় আভাসের মতো, একবার দেখা যায়, দ্বিতীয়বার দেখা যায় না।’

বোধিধর্ম বললেন ‘তুমি আমার মাংসের অধিকারী হলে।’

শিষ্য দাও ইউ বললেন — ‘জগৎ সৃষ্টির চারটি উপাদানই (মাটি, জল, আলো, বায়ু) ফাঁপা। পঞ্চস্কন্দ (রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান বা চৈতন্য) অস্তিত্বহীন।

বোধিধর্ম বললেন —‘তুমি আমার অস্থির অধিকারী হলে।’

হুইকে এগিয়ে এসে গুরুর সামনে মাথা নত করে দাঁড়ালেন। কোনও শব্দই উচ্চারণ করলেন না।

বোধিধর্ম বললেন — ‘তুমি আমার মজ্জার অধিকারী হলে।’

এই যে বোধিধর্ম তাঁর চর্ম-অস্থি-মাংসও মজ্জার অধিকারী করলেন এর তাৎপর্য কী?

আমরা দীক্ষিত নই ফলে আমরা জানি না। আবার এ এমন এক হেঁয়ালি যে দীক্ষিতরাও এর অর্থ ভাষায় ব্যাখ্যা করতে অপারগ। সেই যে চর্যার ৪০ সংখ্যাক পদে কাহ্নপাদ বলেছেন —

‘ভণ কইসে সহজ বোল বা জাঅ।
কাঅ বাক্ চিঅ জসু ন সমায়।।

আলে গুরু উএসই সীস।
বাকপথাতীত কাহিব কীস।।
জে তই বোলী তে ত বিটাল
গুরু বোব সে সীসা কাল।।'

সত্যিই তো 'সহজ' কে ব্যক্ত করা অত সহজ ব্যাপার নয়। কায়-বাক্-চিত্ত সেখানে প্রবেশ করে না। অকারণেই গুরু শিষ্যকে উপদেশ দেন। বাক্পথাতীতকে কী ভাষায় বাঁধা যায়! সুতরাং যতই বলা যায় ততই জটিলতায় জড়িয়ে পড়তে হয়। তাই গুরু এখানে বোবা এবং শিষ্য বধির। মনে রাখতে হবে চর্যাকাররা ছিলেন মহাযানশাখার বজ্রযান উপশাখার সহজিয়া সাধক এবং জেনবাদীরাও মহাযানী। তত্ত্বগত সাদৃশ্য তো কিছুটা থাকবেই। হুইকে জানতেন বাক্পথাতীতকে ভাষায় বাঁধার চেষ্টা বৃথা। তাই তিনি বোধিধর্মের সামনে নিরুত্তর ছিলেন। গুরুও মেপে নিয়েছিলেন শিষ্যের গভীরতা। তাই প্রিয়তম শিষ্যের হাতে ভিক্ষাপাত্র, চীবর ও ভারত থেকে নিয়ে যাওয়া লঙ্কাবতার সূত্রের পুথি তুলে দিয়ে তাঁকে উত্তরাধিকারী নির্বাচন করলেন। হুইকে হলেন বোধিধর্ম -উত্তর সময়ের 'চ্যান' প্রবক্তা তথা দ্বিতীয় আচার্য। হুইকে-র পরে আচার্য হলেন শেং সান (Seng Tsan) তারপর তাওসিন (Tao hsin)। পঞ্চম আচার্য হলেন হুই জেন (Hui Jen)। ষষ্ঠ আচার্য হুই নেং (Hui Neng)-এর সময় 'চ্যান' অনুসারীদের সংখ্যা এমন বেড়ে যায় যে, চিনদেশে এই মতবাদ অনুসারীরা পৃথক বৌদ্ধ সম্প্রদায় হিসাবে চিহ্নিত হয়। চ্যান-ধারায় হুই নেং-এর অনন্য সংযোজন হঠাৎ বোধি (Sudden Enlightenment) লাভ; যা পরবর্তীকালে জাপানি ভাষায় 'সতোরি' (Satori) নাম পেয়ে পৃথিবীব্যাপী পরিচিতি লাভ করবে।

জেন : একটি জীবন্ত বিশ্ববীক্ষা

খ্রিস্টীয় ষষ্ঠশতাব্দীতে চিন থেকে জাপানে বৌদ্ধধর্ম পৌঁছে যায়। এই বৌদ্ধধর্মসূত্রেই চিন থেকে 'চ্যান' জাপানে গিয়ে 'জেন' (Zen) নাম পায়। তবে তা অনেক পরে হেইয়ান যুগে (৭৯৪-১১৮৫)। কামাকুরা যুগে (১১৮৫- ১৩৩৩ খ্রিস্টাব্দে) তা আরও পরিপূর্ণতা পায়। বৌদ্ধ সন্ন্যাসী মাওয়ান এইসাই (Myoan Eisai) হেইয়ান যুগে চিনদেশ থেকে 'জেন' ও চা-সংস্কৃতি জাপানে নিয়ে যান। অতঃপর দোগেন জেনজি (Dogen Zenji) প্রমুখ বৌদ্ধভিক্ষু কামাকুরা যুগে চিনদেশ ঘুরে এসে জাপানে জেন-যাপন শুরু করেন। চিনের মতো জাপানের সভ্যতা-সংস্কৃতিতে জেন-এর সুগভীর ও সুদূরপ্রসারী অবদান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। চিন ও জাপানের বিভিন্ন ধরনের আত্মরক্ষামূলক সামরিক কৌশল, সাংস্কৃতিক দৃঢ়তা, চিত্রকর্ম, সাহিত্য, সিনেমা, চা-সংস্কৃতি জীবন চর্যায় পরিমিতিবোধের চর্চা ইত্যাদির পিছনে জেন-প্রভাব সর্বজনস্বীকৃত বিষয়। জেনদর্শন চিন থেকে কোরিয়ায় পৌঁছে সে দেশের সংস্কৃতিকেও যথেষ্ট প্রভাবিত করেছে। আর বিংশ শতাব্দীর পৃথিবীতে জেন জায়গা করে নিয়েছে আমেরিকা-ইউরোপের দেশে-দেশে। একুশ শতকে পৌঁছেও জেন মোটেও নিষ্প্রভ হয়নি। জেনদর্শনের উপর পথখোঁজা অনুসন্ধিৎসুদের আগ্রহ বেড়েছে বই কমেনি। জেনবিষয়ক বই লিখিত হওয়ার যে ট্রাডিশন বোধিধর্মের অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে শুরু

হয়েছিল তা এখনও থামেনি। কেবল বই লেখা বা গবেষণা নয়, জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে জেন-এর প্রয়োগ নিয়ে গবেষণা চলছে। মনোরোগীদের চিকিৎসায় কীভাবে জেনকে ব্যবহার করা যায় তা নিয়েও হাতেকলমে কাজ চলছে ইউরোপ-আমেরিকায়।

জেনকে কি আমরা একটা স্বতন্ত্র ধর্ম বা উপধর্ম বলতে পারি? হয়তো পারি। তবে আমাদের নাগালে পাওয়া প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মগুলির সঙ্গে এর একটা মৌলিক পার্থক্য আছে। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মগুলি ঈশ্বর-আল্লা-গড বা অন্যান্য দেবদেবী ও স্বর্গ- নরকের অস্তিত্বে আস্থাশীল। তাদের যাবতীয় কার্যকলাপের মুখ্য উদ্দেশ্য মৃত্যুর পরে নরক নামের ভয়ংকর স্থানকে এড়িয়ে স্বর্গ নামের স্ফূর্তিদায়ক সুরম্যস্থানের মৌরসিপাট্টা হাতানো। কিন্তু জেনবাদীদের কাছে এসব হাস্যকর। তাঁরা এইসব অতিপবিত্র ও স্পর্শকাতর ধারণাকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে এই নশ্বর জগতের নির্যাস-সন্ধানে ব্রতী। আমাদের এড়িয়ে যাওয়া একটি ছোট্ট পাখি তার ক্ষীণ শিস, ঘাসের মধ্যে লুকিয়ে থাকা একটি খুদে ফুল, মেঘের আড়ালে উঁকি মারা চাঁদ, জলের উপর হাওয়ার আল্পনা এসবের মধ্যেই অমরত্ব খোঁজেন জেনসাধক। স্বর্গলাভের মোহ বা নরকযন্ত্রণার ভয় তাঁকে ভাবায় না। জেনসাধকের কাছে সমগ্র জীবনটাই জেন। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতি পল তাঁরা উপভোগ করতে চান। তাঁরা অতীত বা ভবিষ্যৎ নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে বর্তমানকেই বেশি গুরুত্ব দেন। তাঁরা জানেন বর্তমান সুখপ্রদ হলে অতীত বা ভবিষ্যৎ ও সুখপ্রদ হতে বাধ্য। নির্লিপ্তি ও নিরাসক্তিকে হাতিয়ার করে জেনসাধক সমস্তরকম প্রতিকূলতাকে শান্তভাবে পাশ কাটিয়ে যান। জেনসাধক জাজেন (Zazen) বা ধ্যানে বসে মনকে স্বাধীনতা দেন যা খুশি ভাবার, একসময় সব ভাবনা দূর হয়ে মনের আকাশ নির্মল হয়ে ওঠে। তখন আর ভালো-মন্দ, সুন্দর-অসুন্দর, পবিত্র-অপবিত্র এইসব দ্বৈতবোধের দ্বন্দ্ব জেন সাধকের মনে রেখাপাত করে না, হালকা মেঘের মতো ভেসে চলে যায়। জেন জগতে কিছুই অনুকরণযোগ্য নয়। জেন অনেকটা প্রণয়ের মতো! প্রত্যেক মানুষের মধ্যে রয়েছে তবে অনুভূতি ভিন্ন ভিন্ন। জেন আসলে তীব্রভাবে জীবন-সম্পৃক্ত একটা দর্শন। জেনবাদীরা এতটাই জীবনবাদী যে জীবনকে সামগ্রিকভাবে অবলোকনের জন্য স্বেচ্ছা দূরত্ব গড়ে নেন। যেমন কোনও ক্রীড়ামোদী দর্শক মাঠে না নেমে গ্যালারিতে বসে পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ করে যান। হয়তো এ তুলনাও ঠিক নয়। আসলে জেন সম্পর্কে যত বলা হয় ততই জটিলতা বাড়ে। এ এক এমন জগৎ যেখানে কোনও বাদবিচার নেই আবার নিয়মেরও শেষ নেই। জেন সাধনায় ব্রহ্মচর্য অবশ্য পালনীয়। তবে সকল জেনসাধক যে ব্রহ্মচর্য মেনে চলেন, এমনটাও নয়। কেউ কেউ সস্ত্রীক সাধনার পথও বেছে নেন। জেন সাধনায় নেশার কোনও স্থান নেই। কিন্তু নেশাড়ু সাধক জেন-জগতে অপ্রতুল নয়। জেনসাধকদের কেউ কেউ মঠকেন্দ্রিক জীবনচর্যায় নিবেদিতপ্রাণ তো কেউ সংসারে সন্ন্যাসী। আবার কেউ কেউ বেছে নেন ভবঘুরে জীবন। জেন-ভাষ্য অনুযায়ী জেন এমন একটা ধাঁধা তা জানলে বা মানলে তো আছেই; আবার না জানলে বা না মানলেও আছে।

সতোরি (Satori) : হেঁয়ালির দুনিয়ার হাতছানি

এই লেখায় জেন নিয়ে যা যা বলা হয়েছে সেগুলি নিছক কিছু তথ্য। এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত যে

এসব তথ্য দিয়ে জেনকে বোঝানো অসম্ভব। হয়তো কিছুটা আভাস দেওয়া চলে। এই আভাস আবার নিছক আভাসমাত্র। কারণ আমরা কেউই জেন-পথের পথিক নই। ফলে এই গূঢ়পথের আভাস দেওয়া বা বোঝা আমাদের সামর্থ্যের বাইরে। তবে কেন এই পণ্ডশ্রম! আসলে হেঁয়ালির দুনিয়ার হাতছানি এড়ানো সত্যিই কঠিন। হেঁয়ালির দ্বারা প্রলুব্ধ হয়েই এ পথে পা-রাখা। কথা না বাড়িয়ে হেঁয়ালির দুনিয়ায় ঢুকে পড়া যাক। জেনসাধকদের অভীষ্ট হল — সতোরি লাভ। বৌদ্ধদর্শনের নির্বাণের সঙ্গে সতোরির সম্পর্ক থাকলেও প্রকৃতিগত দিক থেকে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। দীর্ঘমেয়াদি ও ধীর সাধনপ্রক্রিয়ার ফল নির্বাণ। কিন্তু সতোরি লাভের ক্ষেত্রে সাধক হঠাৎই আলোকিত হন। এই সতোরির আলোকপ্রাপ্তি তাই ক্ষণিক প্রক্রিয়া। তবে এই ক্ষণিক প্রক্রিয়ার জাগরণ ঘটাতে কেউ বছরের পর বছর ব্যয় করেন; তো কেউ কয়েক মাস; আবার কেউ কয়েক মুহূর্ত। সতোরি প্রকৃতপক্ষে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে সত্যজ্ঞান লাভ এবং সেই জ্ঞানের আলোকে নিজের সত্তার স্বরূপকে অর্থাৎ বুদ্ধপ্রকৃতিকে উপলব্ধি করা বা জগৎ ও জীবনের সঙ্গে নিজের নিগূঢ় যোগকে আবিষ্কার করে ফেলা। জেনসাধক সতোরি লাভের জন্য 'কোয়ান'-এর সাহায্য নেন। 'কোয়ান' (Koan) শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল – গণনথি (Public Record)। কোয়ানগুলি যেন জেন-বিশ্ববিদ্যালয়ে সুরক্ষিত নথি। এগুলি জেনগুরুরা তাঁদের শিষ্যদের দিতেন তাদের জেনজ্ঞানকে পরখ করার জন্য। আবার এক জেনগুরু অন্য জেনগুরুকে কোয়ান-ধাঁধার মাধ্যমে ধাঁধিয়ে দিয়ে জ্ঞানগম্যি মেপে নিতে চাইতেন। 'কোয়ান' হল— প্রশ্নের প্রহেলিকা বা এক ধরনের ধাঁধা বা ছোটো ছোটো গল্প। আপাত অর্থে অর্থহীন বলে মনে হলেও এই কোয়ানগুলি গূঢ়তত্ত্বের ধারক। এই আপাত অর্থহীনতার অন্ধকার-গর্ভে লুকিয়ে থাকা হীরক-তত্ত্বই সতোরি লাভের অন্যতম সহায়ক। আমাদের দেশের হিন্দু-বৌদ্ধপুরাণ বা অর্বাচীন কালের বাউল-ফকিরি গানে এমন ধাঁধার সম্মুখীন হই। গুরুবাদী পথে প্রশ্নোত্তরমূলক ধাঁধা একটি সাধারণ বিষয়। জেনধর্ম বা দর্শন গুরুবাদী হওয়ায় সেপথেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। আসুন এখন আমরা কয়েকটি জেন-কোয়ানের ধাঁধার সম্মুখীন হই।

১. এক জেনগুরু গাছের উপর বসবাস করতেন। একদিন জেলাশাসক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। উঁচু গাছের প্রায় মগডালে গুরুকে বসে থাকতে দেখে অবাক হয়ে তিনি বললেন —'আপনি জানেন না গাছের উপর বাস করা অত্যন্ত বিপজ্জনক; যেকোনো মুহূর্তে আপনি নীচে পড়ে যেতে পারেন!' জেনগুরু একটি প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন — 'নীচের পৃথিবী কী সত্যিই নিরাপদ?'

আমরা এই সময়ে দাঁড়িয়ে প্রতিদিন হাড়েহাড়ে টের পাচ্ছি নীচের পৃথিবীর নিরাপত্তাকে! জেনগুরু হয়তো জেলাশাসকের কার্যকলাপে সন্তুষ্ট ছিলেন না। অথবা তিনি পৃথিবীর একটি চিরন্তন অসুখকে তুলে ধরে জেলাশাসকের অহংকে ঘা দিতে চেয়েছিলেন। অথবা এসব না-ভেবেই জেনগুরু নিছক প্রত্যুত্তর দেওয়ার জন্য কথাগুলি বলেছিলেন।

২. এক জেনসাধু আচার্য তোজানকে বললেন — 'আচার্য! কীভাবে ঠান্ডা ও গরমকে জয় করতে পারি?'

— 'যেখানে ঠান্ডা ও গরম নেই সেখানে চলে যাচ্ছ না কেন?' বললেন তোজান।

— 'সত্যি এমন জায়গা আছে প্রভু?'

তোজান বললেন — 'যখন ঠান্ডা পুরোপুরি ঠান্ডা হয়ে যাও; আর গরমের সময় গরম হয়ে ওঠো।' এই হেঁয়ালির কোনো মাথামুণ্ড আছে কী! হয়তো আছে হয়তো এই কোয়ানটি অনুসরণ করে চললে আমাদের জীবন আরও সুগম, আরও অর্থবহ হয়ে উঠবে।

৩. বাতাসে ওড়া একটি পতাকাকে কেন্দ্র করে দুই জেনসাধু তর্কে মেতেছিলেন।

একজন বললেন — 'পতাকাটি নড়ছে।'

অন্যজন বললেন — 'হাওয়া নড়ছে।'

ওই পথ দিয়ে আচার্য হুই নেং যাচ্ছিলেন। তিনি তর্ক শুনে বললেন — 'পতাকাও নয়, বাতাসও নয়; আপনাদের মনই নড়ছে।'

এই হল জেন-কোয়ান যার দ্বারা জেনগুরু শিক্ষার্থীদের বুদ্ধপ্রকৃতি সম্পর্কে সচেতন করেন; প্রজ্ঞার গভীরতা মাপেন। এই কোয়ানটির বক্তব্যের বাস্তবতা-অবাস্তবতা নিয়ে আমরা দ্বন্দ্বে পড়লেও প্রতি পদে পদে মনের গুরুত্ব উপলব্ধি করে থমকে যাই। আরে! এতো ধাঁধার ছলনায় ভুলিয়ে মনের জগৎকে স্বীকৃতি দেওয়া! মন অনন্ত রহস্যের আকর। এই মন, মাঝির মতো আমাদের দেহতরীকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ঘাটে আঘাটায়। কেউ বাঁধানো ঘাটে নেমে স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ছে তো কেউ আঘাটায় নেমে কাদায় মাখামাখি। চর্যায় চাটিল্ল পাদ এজন্যই বলেছেন –

'ভবনই গহণ গম্ভীর বেগে বাহী।
দুআন্তে চিখিল মাঝে ন থাহী।।
ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গঢ়ই।
পারগামী লোঅ নিভর তরই।।"

জেনসাধকেরা চাটিল্ল পাদের মতো দু-তীর কর্দমাক্ত গহীন ভবনদীর মাঝে আক্ষরিক অর্থেই অনির্বচনীয় সাঁকো গড়েছেন। কাদের জন্য? না সকলের নয়; কেবল পারগামীদের জন্য।

জেন গল্প : আত্মদীপ প্রজ্বলনের স্ফুলিঙ্গ

জেনগল্পের সঙ্গে আমাদের পরিচয় তেমন ঘনিষ্ঠ নয়। তবে জেনগল্পের কিছু কিছু ভার্সন বিভিন্ন সূত্রে একটু ভিন্নভাবে আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। এমনটাও হতে পারে জেনগল্পের মতো আলোক-উৎসারী তত্ত্বমূলক সংক্ষিপ্ত আখ্যান হুবহু একই রূপে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তৈরি হয়েছে। কেবল বদলে গেছে স্থান, কাল বা চরিত্রের নাম; কাঠামো একই। পৃথিবীর সকল মানুষের চিন্তাভাবনার মূল-রূপরেখাটি প্রায় একইরকম; এমনটা দাবি করে থাকেন Archetypal Criticism অর্থাৎ আদিরূপাত্মক সমালোচনার অনুসারীগণ। Archetype-এর বাংলা পরিভাষা আদিরূপ বা প্রত্নপ্রতিমা। মনোবিজ্ঞানী কার্ল ইয়ুং কথিত এই আর্কেটাইপ হল মানুষের সমষ্টিগত নিশ্চেতনা (Collective unconsciousness)-য় খোদাই হয়ে থাকা প্রায় একই বিষয়-আঙ্গিকের ধারণামালা। বংশগতিসূত্রে পাওয়া এই সমধর্মী ধারণামালা প্রত্যেক মানুষের মগজে মুদ্রিত হয়ে যায়। আর তাই মানব পরিবারের সকল সদস্যের চিন্তা-কাঠামো একটি নির্দিষ্ট ছাঁদে বাঁধা। যাইহোক আর্কেটাইপসূত্রে আসুক বা মানুষবাহিত হয়ে আসুক আমাদের দেশে কোনও কোনও জেনগল্পের

প্রায় হুবহু প্রতিরূপের সন্ধান মেলে। হতেও পারে আমাদের দেশের পুরাণ বা অন্য শাস্ত্র থেকে গল্পসূত্রগুলি গুরুশিষ্য পরম্পরার পথ বেয়ে ভিনদেশে পৌঁছে গিয়েছিল।

জেনগল্পের আলোচনায় ঢুকলে পঞ্চতন্ত্রের গল্প ও ইশপের গল্পের কথা মনে আসাই স্বাভাবিক। কারণ জেনগল্পের উদ্দেশ্য-বিধেয়র সঙ্গে এইসব গল্পমালার আত্মীয়তা আছে। গল্প শোনানোর ছলে মানুষকে জীবন ও জগৎ সম্পর্কিত গূঢ়তত্ত্বের সন্ধান দিয়ে প্রাজ্ঞ করে তোলার উদ্দেশ্যেই গল্পগুলি রচিত হয়েছিল। তবে তুলনামূলক বিচারে পঞ্চতন্ত্রের থেকে ইশপের গল্পের সঙ্গেই জেনগল্পের কাঠামোগত মিল বেশি। ইশপের গল্প সংক্ষিপ্ত ও উপদেশাত্মক। জেনগল্পও তাই। ইশপ তাঁর গল্পে প্রচলিত সমাজব্যবস্থা ও ধ্যানধারণাগুলিকে তথা মিথ্যাচার ও ভণ্ডামিকে সমালোচিত করেছেন। জেনগল্পেও তেমনটা লক্ষিত হয়। ইশপের গল্পে পশুপাখি চরিত্রের যে মানবায়ন ঘটানো হয়েছে, জেনগল্পে অবশ্য তা করা হয়নি। তবে জেনগল্পের সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা বা উত্তুঙ্গ দার্শনিকতা পঞ্চতন্ত্রে বা ইশপে অনুপস্থিত। জেনগল্পগুলি যেন ঝকঝকে তলোয়ার যা আমাদের জাগতিক মোহ ও মূঢ়তাকে ফালাফালা করে দেওয়ার জন্য সযত্নে নির্মিত।

সাম্প্রতিককালে ছোটোগল্পের ধারায় অণুগল্পের আবির্ভাব ও প্রসার লক্ষ করার মতো বিষয়। অণুগল্প গল্পের কাঠামোয় বিধৃত সংক্ষিপ্ত পরিসরের একটি নিটোল সাহিত্য সংরূপ, যা কাব্যধর্মীতাকে আশ্চর্যরকমভাবে আত্মস্থ করে নিয়েছে। জেনগল্পগুলি অনেকাংশে অণুগল্পের নিকটবর্তী হয়েও স্বাতন্ত্র্যে মহীয়ান। জেনগল্পগুলি আমাদের বোধ ও বোধির জগতে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন তুলতে সক্ষম। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের আচার-আচরণ, আমাদের বংশলালিত ধ্যানধারণা, বিশ্বাসনির্ভর যাপনপ্রণালী ইত্যাদির সামনে একটি জ্বলন্ত জিজ্ঞাসা চিহ্ন ঝুলিয়ে দেয়। আমরা আমাদের ভণ্ডামো, ইতরতা, মাৎসর্য ইত্যাদিকে সহজে চিনে নিতে পারি এইসব অনবদ্য গল্পমালা থেকে। জেনগল্পগুলি সংবেদনশীল পাঠকের জীবনদর্শনকে আমূল উৎখাতের মতো যথেষ্ট বারুদ গর্ভে মজুত রাখে। বাংলা তরজমায় এমন কয়েকটি বারুদগর্ভ জেনগল্প পাঠক সমীপে নিবেদিত হল।

কতিপয় জেনগল্প

কর্দমাক্ত পথ

একদিন তানজান ও ইকিদো নামের দুই জেনসাধক কর্দমাক্ত পথ দিয়ে এক মঠে যাচ্ছিলেন। পথের বাঁকে হঠাৎ তাঁদের চোখে পড়ল রেশমি কিমোনো ও স্যাস পরিহিতা এক অপূর্ব সুন্দরী। পোশাকের কারণে তার পক্ষেপথচলা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। তানজান সেই সুন্দরীকে বললেন — 'ও মেয়ে! এসো দেখি।' বলেই তিনি তাকে দুহাতে পাঁজাকোলা করে তুলে নিলেন। মেয়েটিকে গন্তব্যে পৌঁছে দিয়ে তানজান বিদায় নিলেন। ইকিদো সারা রাস্তায় একটাও কথা বলেননি। রাতে মঠে পৌঁছে তিনি নিজেকে আর সামলাতে পারলেন না। বলেই ফেললেন —'আমরা সাধুরা মেয়েদের কাছেই ঘেঁষি না। বিশেষত সুন্দরী মেয়ে মানে তো একেবারে ভয়ংকর ব্যাপার। তুমি কী করে পারলে এমন কাজ করতে!' তানজান নিস্পৃহভাবে বললেন — 'আমি তাকে পথেই নামিয়ে এসেছি। তুমি এখনও তাকে বহন করে চলেছ।'

ওঃ ! তাই নাকি

হঠাৎ ধরা পড়ল— গ্রামের সবথেকে সুন্দরী মেয়েটি গর্ভবতী। মেয়েটির বাবা-মা তো যুগপৎ ক্রুদ্ধ ও হতভম্ব হয়ে মেয়েকে বললেন — 'বল মুখপুড়ি! কে তোর এমন সর্বনাশ করেছে?' কিংকর্তব্যবিমূঢ় মেয়েটি সংকোচের সঙ্গে জানায় — 'হাইকুন, তোমাদের ওই জেনসাধু।' মেয়েটির বাবা-মা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান। গ্রামের মানুষের পথ প্রদর্শক শ্রদ্ধেয় মানুষটি শেষে কিনা এমন কাজ করলেন! হাইকুনের কাছে গিয়ে তাঁরা মেয়ের অবস্থা ও তার অভিযোগের কথা শোনালেন। হাইকুন সব শুনে শান্ত ও স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন — 'ওঃ! তাই নাকি।'

মেয়েটির সন্তান ভূমিষ্ঠ হল। হাইকুনের কুকীর্তির কথা গ্রামের লোকের আর জানতে বাকি রইল না। গ্রামের সকলে মিলে সদ্যোজাত সন্তানকে নিয়ে হাইকুনের মঠে উপস্থিত হয়ে তাঁকে জানালেন — 'শিশুটির জন্মের জন্য যেহেতু আপনি দায়ী সেহেতু এই সন্তানের দায়ভার আপনাকেই নিতে হবে।' হাইকুন শান্তভাবে জানালেন — 'ওঃ! তাই নাকি।'

হাইকুন বেশ কয়েকমাস শিশুটিকে আদরযত্নের সঙ্গে লালনপালন করলেন। একদিন মেয়েটি তার বাবাকে ডেকে বলল, হাইকুন নয়, তাদের গ্রামেরই এক যুবক শিশুটির বাবা; তাকে আড়াল করতেই সে মিথ্যা কথা বলেছিল। মেয়েটির বাবা-মা তড়িঘড়ি করে ছুটলেন হাইকুনের কাছে। তাঁরা তাঁর সামনে প্রকৃত তথ্য তুলে ধরে বারবার ক্ষমা প্রার্থনা করে শিশুটিকে ফেরত চাইলেন। হাইকুন নির্লিপ্তভাবে তাদের হাতে শিশুটিকে তুলে দিতে দিতে বললেন — 'ওঃ! তাই নাকি।'

যার যেমন চরিত্র

দুই জেনসাধু নদীতে বাসনকোসন ধোয়ার সময় একটি কাঁকড়াবিছেকে জলে পড়ে যেতে দেখলেন। একজন সাধু কাঁকড়াবিছেটিকে জল থেকে তুলে ডাঙায় ছেড়ে দিলেন। এই কাজ করতে গিয়ে তিনি কামড় খেলেন। যন্ত্রণা সহ্য করেও তিনি আবার কাজে মন দিলেন। বিছেটি আবার জলে পড়ে গেল সাধু আবার তাকে জল থেকে তুলে ডাঙায় ছেড়ে দিলেন এবং যথারীতি আবারও কামড় খেলেন। দ্বিতীয় সাধু তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন — 'বন্ধু! কেন তুমি বারবার বিছেটাকে বাঁচাতে যাচ্ছ! তুমি তো জানোই ওর চরিত্রই কামড় দেওয়া!'

সাধু উত্তর দিলেন — 'কারণ তাকে রক্ষা করাই আমার চরিত্র।'

মাছকে জানা

একদিন জেনসাধু চুয়াং সু তাঁর বন্ধুর সঙ্গে নদীর ধারে ঘোরাফেরা করছিলেন। হঠাৎ তিনি বন্ধুর উদ্দেশে বললেন — 'দেখ মাছেরা কেমন সাঁতরে বেড়াচ্ছে। তারা সত্যিই জীবনটাকে উপভোগ করছে।' বন্ধুটি বললেন — 'আরে থামো! তুমি তো আর মাছ না; সুতরাং তারা যে জীবনটাকে উপভোগ করছে তোমার এই ধারণা সত্য নাও হতে পারে।'

চুয়াং বললেন – 'শোনো! তুমি মোটেও আমি না। সুতরাং তুমি কি করে জানবে, মাছেরা সত্যিই তাদের জীবনকে উপভোগ করছে এটা আমি জানি কি না?"

পান্থশালা

একদিন এক খ্যাতনামা জেনগুরু সটান রাজদরবারে ঢুকে সিংহাসনে বসা রাজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। থতমত রাজা তাঁর কাছে জানতে চাইলেন — 'কী চান আপনি?'

— 'আমি এই পান্থশালায় ঘুমাতে চাই।'

— 'এটা আমার প্রাসাদ, পান্থশালা নয়'

— 'আমি জানতে পরি কী আপনার আগে এর মালিক কে ছিলেন?'

— 'আমার বাবা। তিনি এখন মৃত।'

— 'আপনার বাবার আগে এই প্রসাদটার মালিক কে ছিলেন?'

— 'আমার ঠাকুরদা। তিনিও এখন মৃত।'

জেনগুরু মৃদুকণ্ঠে বললেন — 'যে জায়গায় মানুষ কিছুদিন থেকে বিদায় নেয়, সেটাকে পান্থশালা ছাড়া আর কী বলব!'

স্বর্গ

দুজন লোক মরুভূমিতে পথ হারিয়ে ইতস্তত ঘোরাফেরা করছিলেন। তাঁরা ক্ষুধাতৃষ্ণায় এতটাই কাতর ছিলেন যে, যে-কোনও মুহূর্তে তাঁদের মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারত। হঠাৎ তাঁদের কানে এল — ঝরনার ঝরঝর শব্দ, পাখির কূজন। তাঁরা দেখলেন সামনেই এক সুদৃশ্য পাঁচিল, যার গা-বেয়ে বাইরে নেমে এসেছে ফলে ভরা বেশ কিছু ডাল। তাঁদের একজন সেই ডাল ধরে ঝুলে ভিতরে ঢুকে পড়লেন। অন্যজন যে পথে এসেছিলেন সেই পথেই ফিরে চললেন পথহারা পথিকদের এই সুরম্য-উদ্যানের সংবাদ দিতে।

ঋণস্বীকার ঃ

১. চর্যাগীতিকোষ - নীলরতন সেন, সাহিত্যালোক।
২. জেন– রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মডার্ন কলম।
৩. জেন গল্প জেন কবিতা; বীতশোক ভট্টাচার্য, বাণীশিল্প
৪. সটোরি লাভের গল্প - মুজিব মেহদী, পাঠসূত্র।
৫. Bodhidharma : Acollection of stories from chinese literature — Tsutomo Kambe
৬. 101 Zen Stories Transcribed by Nyogen Senzaki and Paul Reps.
৭. The Zen Teaching of Bodhidharma Translatated by Red Pine ; North Point Press.
৮. Koans : Gyomay M.Kubose ;Henry Regnery Company.
৯. Everybody Zen Love and Work : Charlotte Joko Beck , Edited by Steve Smith ; Harper Sanfrancisco.
১০. TheZen Experience by Thomas Hoover ; The New American Library.
১১. Zen Buddhism and Psychotherapy Edited by Polly Young Eisendrath and Shoji Muramoto ; Brunner- Routledge .
১২. Zen Stories to Tell Your Neighbour : True Center Publishing.
১৩. The Great Unraveling : The Gateless Gate ; An imprint of Quantum Press, under the auspices of Quantum Institute Inc. Stephen H. Wolinsky, PhD Library
১৪. Zen Buddhism and the Intrinsic Value of Nature : Simon P. James ; University of Durham.
১৫. Koan Zen From the Inside by Jeff Shore.